ISSN-0971-8397

যোজনা

ধনধান্যে

আগস্ট ২০১৪ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹২০

বিশেষ সংখ্যা

- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫ কৌশলের সামান্য রদবদল
  অসীমা গোয়েল
- সাধারণ বাজেট
  চরণ সিং ও সারদা শিম্পি
- নিরস প্যাকেজিং-এ সরস বাজেট
  রবীন্দ্র এইচ ঢোলাকিয়া
- রেল বাজেট কি এবার কিছুটা বাস্তবমুখী
  এস শ্রীরমণ
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫—একটি সমীক্ষা
  জয়দেব সরখেল
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫ করবিন্যাস ও তার বিশ্লেষণ
  ড. চিত্তরঞ্জন সরকার

বাজেট ২০১৪-১৫

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

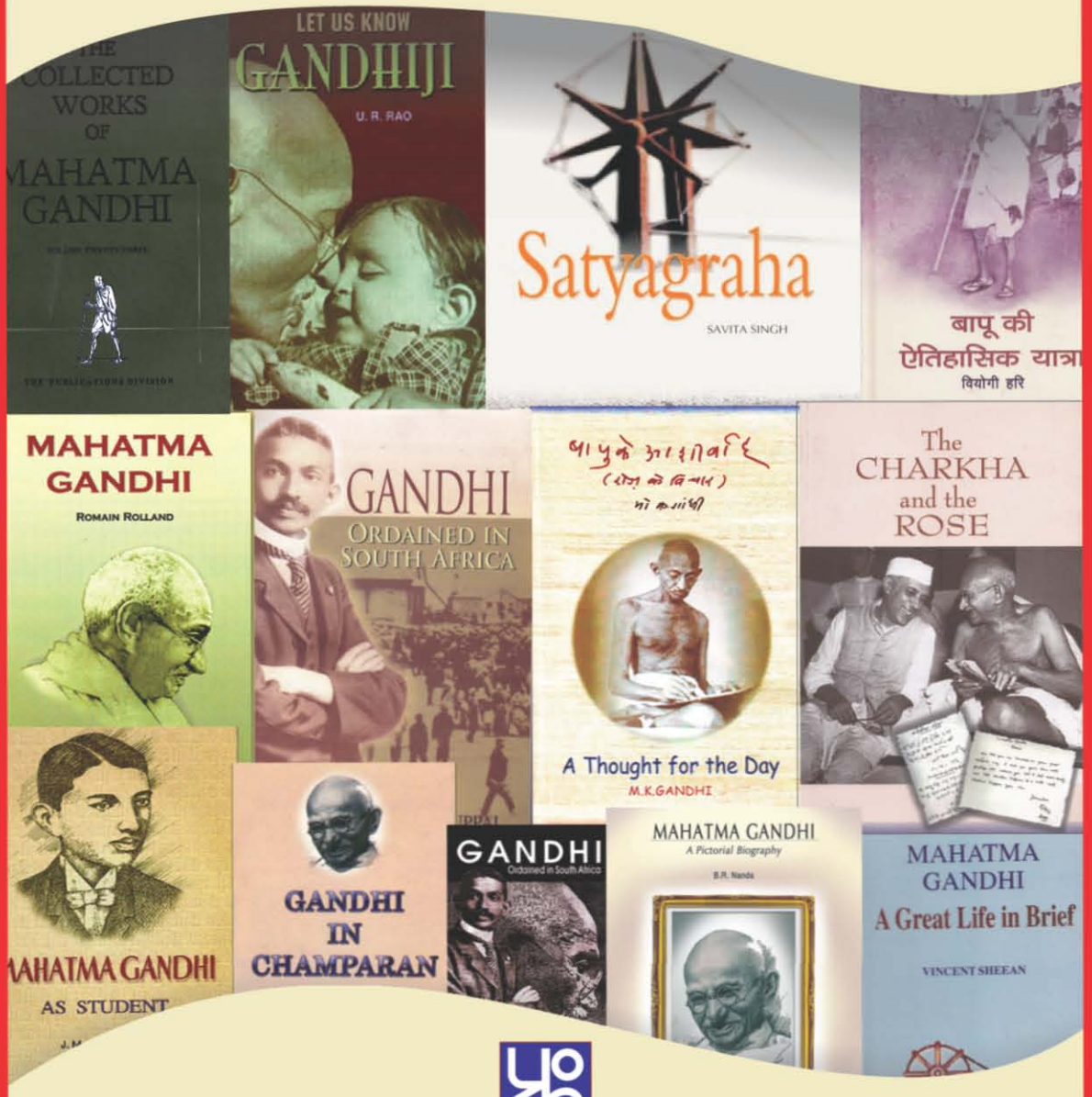

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

August, 2014
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2014
R.N.I. No. 19740/69

New Cheer, New Hope, New Leaf.....

....filled with enjoyable reading

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং বেতার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অ্যাডিশনাল ডায়রেক্টর জেনারেল শ্রীমতী বীণা জৈন কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার,
৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

আগস্ট, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫ কৌশলের সামান্য রদবদল — অসীমা গোয়েল ৫
- সাধারণ বাজেট — চরণ সিং ও সারদা শিম্পি ১১
- নিরস প্যাকেজিং-এ সরস বাজেট — রবীন্দ্র এইচ ঢোলাকিয়া ১৫
- রেল বাজেট কি এবার কিছুটা বাস্তবমুখী — এস শ্রীরমণ ১৯
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫—একটি সমীক্ষা — জয়দেব সরখেল ২২
- ব্যাংকিং সংস্কারের সঙ্গে সামাজিক ব্যাংকিংকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — তপনকুমার ভট্টাচার্য ২৬
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫ করবিন্যাস ও তার বিশ্লেষণ — ড. চিত্তরঞ্জন সরকার ৩০
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫ পরিকাঠামো ক্ষেত্র — ভব রায় ৩৪
- রাজকোষ ঘাটতি অভিমুখ এবং তাৎপর্য — ড. অমিয়কুমার মহাপাত্র ৩৮
- ২০১৪-১৫-র সাধারণ বাজেটের বিনিয়োগমুখীনতা — শশাঙ্ক ভিদে ৪২
- সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বের বিচারে কেন্দ্রীয় বাজেট—২০১৪ — ড. লেখা এস চক্রবর্তী ৪৬
- দারিদ্র এবং অপুষ্টির সমাধান সন্ধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — আশা কপূর মেহতা ও সঞ্জয় প্রতাপ ৫০
- আশা এবং আশঙ্কা, দুটিই ছিল — অনিন্দ্য ভুক্ত ৫৪
- বাজেটে কৃষি, গ্রামীণবিকাশ ও কর্মসংস্থান — লক্ষ্মীনারায়ণ শীল ৫৬
- এ বছরের বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য — পি আই বি ৬০

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত ৬৯
- জানেন কি? (অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প) — মলয় ঘোষ ৭৫
- ফিজিক্যাল এডুকেশন—খেলাই যখন পেশা — মহুয়া গিরি ৭৭
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা ৭৮

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে তার রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না। গত মে মাসে নবনির্বাচিত সরকার তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করেন জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫-র মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে। দেশের নাগরিকদের বিরাট প্রত্যাশার চাপ মাথায় নিয়ে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বাজেট পেশ ছেলেখেলার কথা নয়। গত ৩০ বছরে এই প্রথম পূর্ণ গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে এই সরকার। ফলে জোট রাজনীতির বাধা বিঘ্ন মোকাবিলার সমস্যাও না থাকার ফলে বর্তমান সরকারের সামনে বড় ধরনের নীতি পরিবর্তনে বিশেষ বাধা ছিল না। তবে হ্যাঁ, ভারতের মতো সুবিশাল এবং বৈচিত্রসম্পন্ন দেশে রাতারাতি বিরাট কোনও পরিবর্তন আনা খুব সহজ কাজ তো নয়ই, বিচক্ষণতার পরিচয়ও নয়। কারণ এ ধরনের নীতিগুলি কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। আর সেই কারণে ২০১৪-১৫ সালের এই বাজেটে পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস থাকলেও তা অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ভারসাম্য বজায় রেখে পেশ করা হল।

সরকারের সামনে সব থেকে বড় কাজ যেটা ছিল, তা হল আর্থিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা। গত দুই আর্থিক বছরে দেশের জিডিপি ৪.৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৪.৫ শতাংশে। অর্থনৈতিকভাবে সব থেকে ধীরগতিসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলি ছিল—উৎপাদন, নির্মাণ, খননকার্য ও পরিবহণ। ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও বা ICOR বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির এই ক্রমহ্রাসমানতার প্রতিফলন ঘটে। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালে এই অনুপাত ৪.১ শতাংশ থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং সেই কারণে বৃদ্ধি হারেও শ্লথতা দেখা দেয়। বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো তাই বর্তমান সরকারের নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল এবং সেটাই এবারের বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি। বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য তাই পিপিপি ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ-বান্ধব নীতি এবং তা কার্যকর করার অনুকূল সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টিকে তাই এবারের বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অস্থায়ী কর ঋণ-এর উচ্চসীমা ১০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে; সিদ্ধান্তগ্রহণে দ্রুততার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এই ধরনের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যা বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে।

যোজনা

আর্থিক বৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা—একই সঙ্গে এই দুটিকে বজায় রাখা অসম্ভবই বলা চলে। এবারের বাজেটে কর রাজস্ব বাড়িয়ে এবং ভরতুকি কমিয়ে আর্থিক ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সূক্ষ্ম ভারসাম্যটি ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে জিডিপি-র ৪.১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে এই লক্ষ্যমাত্রাকে যথাক্রমে জিডিপির ৩.৩ শতাংশ ও ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রাও ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৩-১৪ সাল থেকে ২০১৬-১৭-র মধ্যে মোট জিডিপির হারে কর রাজস্বের পরিমাণ ১০.২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১১.২ শতাংশ পর্যন্ত করার কথাও বলা হয়েছে। পরিষেবা কর ও কর সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে আরও জোরদার করে তুলে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া ভরতুকির পরিমাণ কমিয়ে জিডিপি-র ২ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর জন্য অবশ্য ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থাকে আরও সুনির্দিষ্ট করে তুলতে হবে এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতির যেসব ফাঁকফোকর আছে তা আগে বন্ধ করতে হবে।

বাজেট সংক্রান্ত সব আলোচনাতেই তথ্য পরিসংখ্যান প্রাধান্য পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনকে যা সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে তা হল—মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুতের পর্যাপ্ত জোগান, সুস্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। যে কোনও সরকারি নীতির সাফল্য নির্ভর করে, সেই নীতিতে এই সব বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কি না, তার ওপর। উৎপাদনের সুযোগ বাড়িয়ে, রোজগারের ব্যবস্থা করে এবং মানুষের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হয়তো 'সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি'-র শেষ ফাঁকটুকু ভরাট করা সম্ভব হবে।❑

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫

কৌশলের সামান্য রদবদল

এবারের বাজেটে নতুন ক্ষমতায় আসা সরকারের একটি বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ দ্বারা উচ্চহারে অর্থনৈতিক বিকাশ উন্নততর সুযোগসুবিধা, পরিকাঠামো ও প্রশাসনকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। উদ্দেশ্য ও তা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রশংসনীয় হলেও পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। সেসব অসংগতি কোথায় চোখে পড়ছে? সে সব ত্রুটিগুলিই বা রয়ে গেল কেন? লিখছেন **অসীমা গোয়েল**।

প্রথম বাজেট পেশ করল নতুন সরকার। এতে যে সুস্পষ্টভাবে আগামীদিনের একটি বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের একটি দিশা থাকবে তা আশা করা যেতেই পারে। উচ্চহারে অর্থনৈতিক বিকাশ, উন্নততর সুযোগ-সুবিধা, পরিকাঠামো ও প্রশাসনের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছার প্রকাশ পেয়েছে এই বাজেটে, কিন্তু বাজেটে উল্লিখিত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলি ঠিক কীভাবে এই লক্ষ্য পূরণ করবে তা নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।

এটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক। কারণ বেশ কিছু উপায়ে সামগ্রিকভাবে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে জারি রাখার চেষ্টা হলেও এই বাজেট কিন্তু পরিবর্তনের পথেও হাঁটতে চাইছে। ফলাফল আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে তার একটি চিত্র নীচে তুলে ধরা হল :

বিকাশের ম্যাক্রোইকোনমিক সূচকসমূহক

সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনীতিক বা ম্যাক্রোইকোনমিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ও ঘরোয়া সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এই ধরনের বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ে উৎসাহ দিলে বিকাশহারও বাড়ে। সারণি-১-এর প্রথম স্তম্ভে বর্তমান বাজেটের বাজেট হিসাব এবং অন্তর্বর্তী বাজেটের বাজেট হিসাবের পার্থক্যের শতাংশের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে যাতে পূর্ববর্তী সরকারের বাজেটের তুলনায় এই সরকারের বাজেটের পুনর্বিন্যাসের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় স্তম্ভে ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ২০১৪-১৫-এর জুলাই-এর বাজেট হিসাব কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এর ফলে প্রত্যাশিতভাবে সরকারের যে ব্যয়বৃদ্ধি হবে তার প্রভাব অর্থনীতির ওপরও পড়বে। অন্তর্বর্তী বাজেটে অনুরূপ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ছিল তার উল্লেখ রয়েছে তৃতীয় স্তম্ভে। চতুর্থ স্তম্ভটি প্রকৃত পক্ষে প্রতিশ্রুতিগুলির রূপায়ণ কতটা সম্ভব তারও সূচক কারণ এখানেই অতীতের কাজকর্মের যথার্থ হিসাব পাওয়া যাচ্ছে—২০১২-১৩ সালের প্রকৃত হিসাবের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত হিসাবে কতটা পরিবর্তন হয়েছে তাও এখানে দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অন্তর্বর্তী বাজেটে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার পাশাপাশি বর্তমান বাজেটে এই লক্ষ্যে যে এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ছবিটাও প্রথম স্তম্ভে তুলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনাখাতে রাজস্ব ব্যয়, পরিকল্পনার বাইরে মূলধন সৃষ্টি—পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধনি ব্যয় এবং মূলধনি সম্পদ সৃষ্টিতে অনুদানখাতে পূর্ববর্তী বৃদ্ধির (চতুর্থ স্তম্ভ) তুলনায় এবারে বড়মাপের বৃদ্ধির (দ্বিতীয় স্তম্ভ) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিনিয়োগের সামান্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ ধরে রাখা এবং তার উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য একগুচ্ছ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রের মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সমস্ত পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল। এর মধ্যে রয়েছে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাময়িক কর ছাড়। এই ধরনের কর ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নিম্নসীমা কমিয়ে করা হয়েছে ২৫ কোটি টাকা; আগে এই নিম্নসীমা ছিল ১০০ কোটি টাকা। এই নিম্নসীমা কমার ফলে এবার থেকে উৎপাদন ক্ষেত্রের অনেক অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর ছাড়ের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমনকী স্থানীয় স্তরেও।

এরজন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিল্প তথা শিল্পমহলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত পরিষেবা রয়েছে সেগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক একক জানালা বিশিষ্ট e-BIZ চালু করা তথা বিভিন্ন শিল্প করিডর ও শিল্প ক্লস্টার স্থাপনের কথাও রয়েছে বাজেটে।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনও বিমার মতো কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে উৎসাহ দেওয়া হলে সরাসরি বিনিয়োগ ও ঘরোয়া বাজারে চাকরি বাড়বে, প্রযুক্তির প্রসার ঘটবে এবং সেইসঙ্গে অর্থের জোগান সহজলভ্য হবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ

সারণি-১ বাজেটের মূল হিসাব নিকাশ (বৃদ্ধির শতাংশ)				
	পুনর্গঠন	প্রত্যাশিত প্রভাব বর্তমান বাজেট হিসাব	প্রত্যাশিত প্রভাব অন্তর্বর্তী বাজেট হিসাব	সম্ভাব্যতা
	অন্তর্বর্তী বাজেট হিসাবের তুলনায় বর্তমান বাজেট হিসাব	আগের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় বর্তমান বাজেট হিসাবের বৃদ্ধি		২০১২-১৩ সালের প্রকৃত হিসাবের তুলনায় আগের সংশোধিত হিসাবে বৃদ্ধি
	১	২	৩	৪
রাজস্ব ঘাটতির অনুপাত	—৩.৩৩	—১২.১২	—৯.০৯	—৮.৩৩
রাজকোষ ঘাটতির অনুপাত	০.০০	—১০.৮৭	—১০.৮৭	—৪.১৭
প্রাথমিক ঘাটতির অনুপাত	০.০০	—৩৮.৪৬	—৩৮.৪৬	—২৭.৭৮
পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধনি ব্যয়	৫.১৭	২০.৭২	১৪.৭৯	৫.৭৯
পরিকল্পনাখাতে মোট ব্যয়	৪.০০	২০.৯০	১৬.৮০	১৪.৯৭
পরিকল্পনাখাতে রাজস্ব ব্যয়	২.৫৪	২১.৯৬	১৮.৯৪	১২.৯৫
পরিকল্পনাখাতে মূলধনি ব্যয়	৭.৪৭	১৭.১৮	৯.০৪	২২.৮২
মোট রাজস্ব ব্যয়	১৫.৮০	১২.৮৬	—২.৫৪	১২.৭৭
মূলধনি সম্পদ সৃষ্টিতে অনুদান	১৪.৬৮	২১.৬১	৬.০৪	১৯.৪৬
পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব ব্যয় যার মধ্যে	০.৬২	৮.৪৬	৭.৭৯	১২.৪০
ভরতুকি	১.৯৪	২.০১	০.০৮	—০.৬১
সামাজিক পরিষেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি)	২.০৩	—০.৪০	—২.৪০	২০.১৭
মোট মূলধনি ব্যয়	৬.৩৯	১৮.৮০	১১.৬৬	১৪.৪১
রাজস্ব আয়	১.৯৪	১৫.৫৯	১৩.৪০	১৭.০৬
মূলধনি আয়	১.৫২	৭.৮৩	৬.২২	৫.৬৬

সূত্র : indiabudget.nic.in-এ প্রাপ্ত বাজেট নথি থেকে গণনা করা হয়েছে।

থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে; কিন্তু এতে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ভারতেই থাকবে। এর পাশাপাশি, বিশেষ করে স্বল্পমূল্যের আবাসন ও স্মার্টসিটির নির্মাণ ও মূলধনি অবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত অর্থ জোগাড়ের লক্ষ্য নিয়ে গৃহস্থালির সঞ্চয় বাড়ানোর উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে, 'গ্রাহককে জানুন' বা 'নো ইয়োর কাস্টমার' নিয়মকানুনের সরলীকরণ তথা একটি একক অপারেটিং ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট আদতে আর্থিক সঞ্চয়ের প্রবণতাকেই উৎসাহিত করবে।

এছাড়া 'পাম-থ্রু' করের সুবিধা অর্থাৎ কর্পোরেট কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার ফলে রিয়্যাল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্টগুলি সাধারণ মানুষের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের প্রবণতাকে যেমন উৎসাহিত করবে তেমনই দেশীয় বাজারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বিলগ্নীকরণ ও সাধারণ গ্রাহকদের শেয়ার বাজারে টেনে আনবে। অন্যদিকে বিধিবদ্ধ নগদ সদৃশতার অনুপাত (স্ট্যাটিউটরি লিকিউডিটি রেশিও), নগদ জমার অনুপাতের (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) সীমা কমে যাওয়া ব্যাংকগুলি এবার থেকে আরও সহজে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের অনুমোদন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো প্রকল্পে ঋণদান করতে পারবে।

করভারের সিংহভাগ বহন করতে হয় বেতনভোগী শ্রেণিকে। এবারের বাজেটে এই বেতনভোগী শ্রেণির জন্য কিছু ছাড় রয়েছে। বাছাই করা কিছু শিল্পকে অন্তঃশুল্কেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে রাজকোষে করের যে ক্ষতি হয় এর ফলে তা যেমন পূরণ হবে, তেমনই শিল্পের জন্য চাহিদাও বাড়বে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের জন্য যে কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে তাও পূরণ হয়ে যাবে, কারণ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ফলে আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হলে আরও বেশি পরিমাণে কর আসবে।

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কমাতে কার্যকরী ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র মজুত খাদ্যপণ্যের ঠিকমতো বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছে। এপিএমসি আইনে আরও কার্যকর রদবদল ঘটানোর জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বাজেটে। সেইসঙ্গে, কৃষিসামগ্রী গুদামজাতকরণের উন্নততর ব্যবস্থাপনা, ভারতীয় খাদ্য নিগমের (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) পুর্নগঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা আরও

উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যেমন—সেচ, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ফিডার পৃথকীকরণ, সড়ক এবং গৃহনির্মাণ ইত্যাদি। জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মপ্রকল্পে (এনআরইজিএ) বরাদ্দ বজায় রাখা হয়েছে কিন্তু এই বরাদ্দ সম্পদসৃষ্টির লক্ষ্যেই ব্যয় করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানও জারি থাকবে। গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের জন্য যে তহবিলটি গড়া হচ্ছে তা থেকে খাদ্যমজুতকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যাবে।

গত বছর মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলায় জোরদার প্রচেষ্টার ফলে চলতি খাতে কিছুটা ঘাটতি কমার পাশাপাশি টাকার দাম কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনে (ব্যালান্স অফ পেমেন্ট) ধারাবাহিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে দীর্ঘমেয়াদিভাবে দেশীয় আর্থিক সঞ্চয় বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে আরও সংহত করা জরুরি। দেশের আর্থিক বাজারকে আরও সংহত করার পদক্ষেপ নিলেও অর্থমন্ত্রী যে বৈদেশিক ঋণ প্রবেশের পথ আরও উন্মুক্ত করে দেননি এটা ভালো লক্ষণ। দেশীয় বাজারে সরবরাহের ক্ষেত্রে যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করার পর বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নত হলে রপ্তানি উৎসাহ পাবে। একটি রপ্তানি প্রসার মিশন গঠনের কথাও রয়েছে বাজেটে। সেইসঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

অচলাবস্থার সমাধান

পূর্ববর্তী বাজেটগুলিতে সরকারের রাজকোষ ব্যয়ের এমন ধরন ছিল যাতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্যের চাহিদা বেড়ে যেত, অথচ কৃষিক্ষেত্রে নানা ধরনের বিধিনিষেধের দরুন চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ থাকত না। আবার সরকারের আর্থিক নীতির দরুন মানুষের হাতে থাকা ব্যয়যোগ্য অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ভোগ্যপণ্যখাতে ব্যয় হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। এ থেকে বোঝা গেছে যে অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রত্যাহার এক্ষেত্রে কার্যকর হবে। শুধুমাত্র ব্যয়সংকোচ নয়, এক্ষেত্রে আর্থিক সংহতি সাধনের (ফিসক্যাল কনসোলিডেশন) মানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত সরবরাহের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ হস্তান্তরের নীতি স্থির হওয়া উচিত।

দুটি বিষয়ের জন্য মূলত সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো যায় না। একটা পুরো ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরভাবে ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত করতে অনেক সময় লাগে, বিশেষ করে ব্যয়ের লক্ষ্য যদি বদলাতে হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থের অভাব সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যদি না অন্যান্য সরকারি খরচে রাশ টানা যায়। এবারের বাজেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের পরিবর্তন যা হয়েছে তা খুবই সামান্য কারণ রাজস্ব ব্যয়ে বিশেষ লাগাম পরানো যায়নি। এখানে কিছু করছাড় হয়েছে। রাজকোষ ঘাটতির ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য তাও বজায় রাখা হয়েছে (সারণি-১)।

ভরতুকিগুলিকে আরও যুক্তিসংগত হারে কাটছাঁট করার বিষয়ে ব্যয় পরিচালনা কমিশনের প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আদতে সারের ভরতুকি বাড়ার দরুন ভরতুকির বহর বেড়েছে (সারণি-১)। মোট ভরতুকি পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশে বেঁধে রাখা গেলেও একে প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হয়। বাজেট হিসাবে রাজকোষ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেটে বেশি কিছু ব্যয়ের বিলোপ ঘটানো হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলিকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে এবং মূলধনি ব্যয় নজরে পড়ার মতো কমানো হয়েছে। এমনকী বাজারও স্বল্পমেয়াদে এরকম ঢিলেঢালা লক্ষ্য সামনে থাকলে খুশিই হবে যেখানে এই ধরনের কোনও সতর্কতা বা কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন থাকছে না।

তবে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংহতি সাধনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যা যথেষ্ট ইতিবাচক বিশেষত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ সরকারে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়জনিত কারণে আমরা সবেমাত্র ধীরে ধীরে একটা চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠছি। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি লাভের চিন্তা আর্থিক সংহতি সাধনের উপাদানগুলিকে উন্নত করার সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারে। আর্থিক সংহতি সাধনে গুণগত মান ও এই সংহতি সাধনের উদ্যোগ কতটা খাঁটি সেটাই আসলে দেখার। সরবরাহের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিই মূলত মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিশ্বে আমাদের দেশেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ। তাই আমাদের পশ্চিমের দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে আর আর্থিক বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

আর্থিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা মস্ত বড় ঝুঁকিও লুকিয়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ অনুকূল পরিবেশের পুনরুজ্জীবন ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পালে ভর করে আর্থিক বিকাশ প্রক্রিয়া শক্ত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম বেড়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে ডিজেলের দাম বাড়লে ভরতুকির পরিমাণ কমবে। বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে আরও সহায়সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে, কারণ দেশের শেয়ার বাজার এখন যথেষ্ট চাঙ্গা। অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে যে আশাব্যঞ্জক আভাস দেওয়া হয়েছিল এই বাজেটেও তা রেখে দেওয়া হয়েছে এবং এই আভাস মিলে যাওয়াও সম্ভব। কারণ এই অঙ্কটা ২০১৩-১৪-এর সংশোধিত হিসাবের ১৭.১-এর তুলনায় অল্প নীচে ১৫.৬-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তা ২০১২-১৩ প্রকৃত অঙ্কের তুলনাতেও বেশি (সারণি-১)। এই ধরনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিকূলতা রয়েছে সেগুলোই বেশি অনুকূল হয়ে পড়ে। কিন্তু এসমস্ত ক্ষেত্রে কিছু কিছু সেকেলে অনুৎপাদক কৌশলের ঝুঁকি রয়ে যায় যেমন, লক্ষ্য পূরণের জন্য বিনিয়োগ ছাঁটাই—এতে একদিকে আর্থিক বিকাশ যেমন মার খায়, তেমনই অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি বেলাগাম হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত বিষয়টি হল আর্থিক পারিতোষিকের সঙ্গে সামর্থ্যের মেলবন্ধন। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা পারিতোষিক প্রদানের পরিকল্পনা এমনভাবে করা উচিত তা যাতে সামর্থ্য বা দক্ষতা সৃষ্টি করে এমনকী এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনে সুযোগের সমতার বৃদ্ধি ঘটালেও ক্ষতি নেই। বর্তমানে একটি স্থিতিশীল সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কার্যকালের মেয়াদের শুরুতেই সরকারের সামনে দ্রুত জনমোহিনী নীতির ফাঁদ এড়িয়ে উৎপাদনমুখী নীতি গ্রহণের অনেক স্বাধীনতা ও সুযোগ রয়েছে। তবে স্থিতাবস্থা থেকে সরে আসার ঝুঁকি নিতে না পারলে নির্বাচনের জনাদেশের প্রতি ভয়াবহ অবিচার হবে।

সর্বস্তরের জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে শামিল করা

ভোটদাতারা চান উন্নতমানের সরকারি পরিষেবা যেমন পরিকাঠামো, জল, অনাময়, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা যাতে কাজের সুবিধা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞদের (অ্যাসেমোগলু এবং রবিনসন, ২০১২) মতে, এই ধরনের পরিষেবাগুলি জোগান ব্যাপকভাবে সুনিশ্চিত করে তোলার মাধ্যমেই গণতন্ত্র সমৃদ্ধি আনতে পারে। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার বিষমসত্ত্ব চরিত্র এবং ভোট-ব্যাংকের রাজনীতির ফলে এই মূল বিষয়গুলির ওপর থেকে দুটি সরে গেছে এবং সেই ট্র্যাডিশনই বজায় রয়েছে।

'সোশ্যাল মিডিয়া' এখন মানুষের সচেতনতা অনেক বাড়িয়েছে। ফলে এখন বাস্তবিক অর্থে এক 'ভার্চুয়াল' মধ্যবিত্ত শ্রেণির রমরমা। গ্রাম থেকে মফস্‌সল এলাকায় মানুষের ভিড় বিপুল সংখ্যক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসে তরুণ প্রজন্মের অংশ লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। এই সমস্ত শ্রেণি সরকারি দাক্ষিণ্য নয়, বরং অনুকূল কাজের পরিবেশ পেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে।

সারণি-২
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ (বৃদ্ধির শতাংশ)

	পুনর্গঠন	প্রত্যাশিত প্রভাব বাজেট হিসাব	প্রত্যাশিত প্রভাব অন্তর্বর্তী বাজেট হিসাব	সম্ভাব্যতা
	অন্তর্বর্তী বাজেট হিসাবের তুলনায় বর্তমান বাজেট হিসাব	আগের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় বর্তমান বাজেট হিসাবের বৃদ্ধি		২০১২-১৩ সালের প্রকৃত হিসাবের তুলনায় আগের সংশোধিত হিসাবে বৃদ্ধি
	১	২	৩	৪
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যয়	৪.২২	−২১.১০	−২৪.২৯	২৩.২০
এক্সটার্নাল বাজেট (বহিঃবাজেট)	−০.০৯	−৩.৭৬	−৩.৬৭	৩২.৯৮
বাজেট সহায়তা	৯.১৫	−৩৩.৬৩	−৩৯.২০	১৬.৯৮
ক্ষেত্রসমূহ				
কৃষি	১৫.৪৬	−৩৪.৩২	−৪৩.১২	৩.০৯
গ্রামোন্নয়ন	৬.২০	−৯৩.৯১	−৯৪.২৭	১৩.৯৪
সেচ	২৪.৪৫	২৮৭.২৮	২১১.২১	৫.৬৯
শক্তি	১.৭৪	−৬.৯৯	−৮.৫৮	৩৫.২৯
শিল্প ও খনিজ দ্রব্য	৪.১৬	১১.১৮	৬.৭৪	৮.৯৩
পরিবহণ	৪.৬৬	৬.৫৮	১.৮৪	২০.৪৫
যোগাযোগ	−০.০৮	৩৯.৩৯	৩৯.৫০	৪৮.৪০
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ	৭.৮৮	৩৮.৪৩	২৮.৩২	১২.৬৭
মন্ত্রক সমূহ				
সামাজিক পরিষেবা	৫.৭৩	−৫১.৬৯	−৫৪.৩১	২০.৪৯
মানবসম্পদ উন্নয়ন	৫.৩৩	−৭১.৪৩	−৭২.৮৮	১১.৪০
স্বাস্থ্য	৯.০৬	−৬৭.৫৮	−৭০.২৭	১১.৭১
পানীয় জল ও অনাময়	০.০০	−৯৮.০৮	−৯৮.০৮	−৭.৪৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯.০৬	−৬৭.৫৮	−৭০.২৭	১১.৭১
আবাসন ও দরিদ্র দূরীকরণ	০.০০	৭৭.৬৩	৭৭.৬৩	৩৩.২৯
মানবসম্পদ বিকাশ	১১.২৫	−৯৪.৫৭	−৯৫.১২	৭.৩৬
বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সাক্ষরতা দপ্তর	৭.০২	−৯৩.৭০	−৯৪.১১	১০.১৩
উচ্চশিক্ষা দপ্তর	৫.০০	−০.০২	−৪.৭৮	১৫.৬৭
শ্রম ও কর্মসংস্থান	২২.৮৭	−৫৩.২২	−৬১.৯৩	−০.২৩
জলসম্পদ	৮৫.৪৩	৩৬৩.৫৭	১৫০.০০	৩৬.৪৫
নারী ও শিশু বিকাশ	১১.২৫	−৯৪.৫৭	−৯৫.১২	৭.৩৬

সূত্র : indiabudget.nic.in-এ প্রাপ্ত বাজেট নথি থেকে গণনা করা হয়েছে।

এমনকী, বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় চাকরির সুযোগ হাতের নাগালে আসায় নিম্ন আয়ের শ্রেণির মানুষরাও আজ অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন।

আগে সরকারের মূলমন্ত্র ছিল 'বিকাশ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষকে শামিল করা' বা এক কথায় সামুদয়িক বিকাশ, কিন্তু এখন নতুন মন্ত্র হওয়া উচিত 'বিকাশ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে শামিল করা' (অ্যাকটিভ ইনক্লুশন)। আর উৎপাদনশীলতা ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির (গয়াল, ২০১৪) পাশাপাশি শুধুমাত্র যারা স্থায়ীভাবে দরিদ্র তাদেরই পুষ্টিবিধান, শিক্ষায় (বা অন্যান্য কার্যকর প্রকল্প) সরাসরি আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। এর পাশাপাশি, উন্নত অনাময় ব্যবস্থা ও জলের বন্দোবস্ত কিন্তু উৎপাদনশীলতা বাড়ায় আর এগুলিই দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টিবিধানের সবচেয়ে কার্যকর কর্মসূচি।

এবারের বাজেটে পরিকাঠামো, আবাসন, জলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি দূর করা গেলে আমনাগরিকদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে। সারণি-২-এর ১ ও ২ স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে আবাসন ও সেচ-এ ব্যয় বিপুল বাড়ানো হয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্র

গয়ালের মতে (২০১২) ব্যয় সংকোচ করেও যদি অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়া জারি রাখতে হয় তাহলে সরকারি প্রকল্পগুলির এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে সেগুলি মানবসম্পদসহ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিকাশ তথা কর্মসংস্থানের পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্য নিয়েই সমস্ত ব্যয় পরিচালিত হওয়া উচিত, ব্যয় হওয়া প্রতিটি টাকার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার যাতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এরজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যয়ের পুনর্বণ্টন প্রয়োজন।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রসমূহ তথা মন্ত্রকগুলির জন্য বরাদ্দ কমার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে (সারণি-২)। তবে এই সিদ্ধান্তগুলির বেশিরভাগই অন্তর্বর্তী বাজেটে নেওয়া হয়েছিল। এবং বর্তমান বাজেটে সেই সিদ্ধান্তগুলিই বজায় রাখা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার হয়তো বা এটা উপলব্ধি করেছে যে সামাজিক ক্ষেত্র বরাদ্দের ফলে অর্থনীতিতে চাপ পড়ছে, বা এই বরাদ্দে কাটছাঁট করা সবচেয়ে সোজা, কিংবা মন্ত্রকগুলি বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। কিন্তু সারণি-২-এর ৪নং স্তম্ভে এটা স্পষ্ট যে এর আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলি বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগই ব্যয় করে ফেলেছে।

দ্রুত কোনও বড়সড় পরিবর্তন আনার পথে আমলাতন্ত্রের বাধা পেরোনো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমান সরকার মূলধন সৃষ্টির জন্য অনুদান বৃদ্ধির মাধ্যমে আদতে সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধিই করেছে এবং এই অনুদান রাজস্ব ব্যয়ের খাতে পড়ছে (সারণি-১)। সেই সঙ্গে সরকার বস্ত্র, পর্যটন ও নির্মাণের মতো শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তবে কথা নয়, কাজই আসল। আশা করা যায় কাজই হবে বর্তমান সরকারের বিশেষত্ব। তবে আগে থেকে সব কিছু ধরে নেওয়া ঠিক নয়। পরিকল্পনাখাতে কেন্দ্রীয় যোজনা বরাদ্দের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে ভেদাঙ্ক (কো-এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়শন)-ভিত্তিক একটি সূচকে (গয়াল, ২০১০ থেকে হালনাগাদ করা হয়েছে) সংস্কার পরবর্তী আমলের সরকারগুলিকে একটি ক্রমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সূচক অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস (–০.৬) তারপরই ইউপিএ-১ (–৩)। এনডিএ রয়েছে তৃতীয় স্থানে (–৭.১)। আর অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে ইউপিএ-২। এবার অতীতের ছায়া থেকে বেরিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

উৎসাহদান-ব্যবস্থাপনাগুলিকে উন্নততর করা

যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কাজ হয় সেখানে যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। সেকেলে প্রশাসনিক কাঠামোর জন্যই অনাবশ্যক বিলম্ব হয়। ২০০৯ সালে একটা ঘটনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে দেরির জন্য অনুৎপাদক ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। পরবর্তী বিষয়টি একটি বড় মাপের দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে যুক্ত যার আভাস পাওয়া গিয়েছিল সিএজি রিপোর্টে এবং ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে। তবে দুর্নীতি বা সিবিআই তদন্তের আশঙ্কা বিলম্ব ঘটালেও এগুলি কিন্তু সরকারের নীতি পঙ্গুত্বের মূল কারণ নয়। কিন্তু বাজেটে এই বিষয়টির সমাধানের কোনও চেষ্টাই নেই। পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারে মন্ত্রীর সংখ্যা কমলেও ইউপিএ আমলে ৫০টি মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকলে এবার ৪৯টি মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং মন্ত্রকের মধ্যে সমান্বয়সাধন বা মেলবন্ধনে কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টা কিন্তু নেই। তার বদলে অল্প পরিমাণে প্রারম্ভিক মূলধন নিয়ে অনেক নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে অর্থের সদ্ব্যবহারে সরকার অপারগ, তাই প্রাথমিক বরাদ্দ এভাবে মেপে দিতে হয়েছে। তবে যারা অর্থের যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম তাদের জন্য বরাদ্দ আরও বেশি থাকলে তা উৎসাহদান ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করত। এই ব্যবস্থার যথাযথ রূপায়ণের জন্য আনুষঙ্গিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। উন্নততর প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো দরকার।

তবে ভ্রান্ত উৎসাহদান ব্যবস্থা ভারতীয় সরকারি পরিষেবার মানকেই ব্যাহত করে। যেমন ভরতুকির কথাই ধরা যাক। এখানে ভরতুকির অঙ্কের চেয়েও যেভাবে ভরতুকি দেওয়া হয়, সেটাই বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে—ভরতুকির ফলে মূল্য ও বণ্টনে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্যের ওপর ন্যূনতম সহায়কমূল্য ভরতুকি চলে আসার ফলে চাহিদা সত্ত্বেও শাকসবজি বা প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য পণ্য উৎপাদনে অবহেলা দেখা দিচ্ছে। জ্বালানি তেলের ওপর ভরতুকির দরুন শক্তি সঞ্চয়ের বিকল্পগুলির কথা ভেবেই দেখা হচ্ছে না। ডিজেল ও কেরোসিনের ওপর দ্বৈত ভরতুকির (ক্রশ সাবসিডাইজেশন) ফলে দূষণ আর দুর্নীতি ছড়াচ্ছে। সমাজকে এর চরম মূল্য দিতে

হচ্ছে। যেমন পাঞ্জাবে ক্রমবর্ধমান ক্যান্সারের ঘটনা! ভরতুকিগুলিকে যুক্তিসংগত করতে গেলে যাদের প্রকৃত অর্থের ভরতুকির প্রয়োজন তাদের কাছে সরাসরি ভরতুকির অর্থ পৌঁছে দেওয়ার পন্থাকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে হবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষত কর কাঠামো ও প্রশাসনিক বিষয়ে লেনদেনের চড়ামূল্য ও অনুৎপাদক লেনদেনের সম্ভাবনা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা সরলীকরণ এবং অভিযোগগুলি শুনে তা নিরসনের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। কর সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা কমানো, অনিশ্চয়তা দূর করা বিভিন্ন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সুগম করার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। দেশীয় করদাতারা এবার থেকে কর সংক্রান্ত আগাম রায় পেতে পারবেন। শিল্প মহলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যাগুলির শোনার জন্য একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গড়া হবে। মিউচুয়াল ফান্ড থেকে হওয়া আয়ের ওপর এবার থেকে আয়কর প্রযোজ্য হবে না। একে মূলধনি আয় হিসেবে গণ্য করে মূলধনি আয়ের ওপর কর নেওয়া হবে। এছাড়া, 'ফান্ড লোকেশন'-এর ক্ষেত্রে লেনদেনের (আরবিট্রাজ) ওপর 'ইনসেনটিভ'ও তুলে দেওয়া হয়েছে।

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কমানোর দিকে পদক্ষেপ হিসাবে পরিষেবা ক্ষেত্রের কর ভিত্তি বাড়িয়ে কর-রাজস্ব বিপুল বাড়ানো হয়েছে। করের হার কম অঙ্কে বেঁধে করের ভিত্তি বাড়ানো অর্থাৎ আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে করের আওতায় এনে মোট করের পরিমাণ বাড়ানোর নীতি ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশের পক্ষে একদিকে যেমন যুক্তিযুক্ত অন্যদিকে ন্যায়সংগত বটে। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান কোটিপতি শ্রেণি আরও বেশি পরিমাণে কর দিয়ে দেশের উন্নয়নে অবশ্যই আরও বেশি করে অবদান রাখতে পারেন। তবে ধনী শ্রেণির ওপর অস্থায়ীভাবে যে অধিকর বা সারচার্জ বসানো হচ্ছে এর সর্বনিম্ন সীমার অঙ্কটা আরও বাড়িয়ে এই অধিকরকে পাকাপাকিভাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার, টিআইএন তথ্য ভাণ্ডারের তথ্য, এবং পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোগ্য কর আদায়—এই সবকিছুর হাত ধরে দেশের করের ভিত্তি অনেক সম্প্রসারিত হতে পারে। দেশের কর ভিত্তি বর্তমানে অত্যন্তই কম। বর্তমানে মাত্র ৩ শতাংশ ভারতীয় কর দিয়ে থাকেন যেখানে চীনে করদাতার সংখ্যা ২০ শতাংশ। অর্থাৎ এদেশে করভিত্তি সম্প্রসারিত করার এখনও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাজেট এই লক্ষ্যে একটা ছোট্ট পদক্ষেপ নিয়েছে মাত্র।

পরিশেষে

বাজেটে এই বিভিন্ন কৌশলকে সাজিয়ে একটা পুরোদস্তুর কর্মপরিকল্পনা রচনার চেষ্টা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে চেষ্টা আংশিক; পুরোপুরি ত্রুটিমুক্তও নয়। কারণ এখনও অনেক অসংগতি চোখে পড়ছে এই বিষয়গুলিকে শেষ পর্যন্ত সংগতিপূর্ণ করে তোলা যাবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ বাড়ানোর নানান উপায় ও সেগুলিতে অর্থ জোগান বাড়ানোর পন্থাগুলি আদতে আর্থিকবিকাশ ও চাকরির সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একে অপরকে জোরদার করবে। কর্মসংস্থান নিবিড় বিভিন্ন ক্ষেত্র, পরিকাঠামো, আবাসন, কৃষিবিপণন এবং শস্য পরিবহণের ওপর গুরুত্ব দিলেও একই ব্যাপার ঘটবে। উন্নততর ব্যবস্থাপনা, উৎসাহদানমূলক পারিতোষিক (ইনসেনটিভ), সরকারি ব্যয় এবং সরকারি পরিষেবার ধাঁচ সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুটা হলেও এগোনো গেছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ আর্থিক বিকাশে যেমন সহায়ক হবে তেমন সামর্থ্য সৃষ্টির মাধ্যমে একটা সমতার পরিবেশও আনবে। এর ফলে অর্থনীতির সামনে যে প্রতিবন্ধকতাগুলি ছিল সেগুলি দূর হবে। এর আগে ভোগের নিরিখে সরকারি ব্যয়ের ধাঁচ মুদ্রাস্ফীতিকেই বাড়িয়েছে।

তবে অর্থমন্ত্রীর তাঁর বাজেট ভাষণে স্পষ্টভাষায় এমন কোনও আশার কথা শোনাননি। বরং পুরোনো ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই, যেটুকু ঝুঁকি নিয়েছেন সেটুকুকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। সকলের জন্যই কিছু না কিছু দিয়েছেন। বোঝানোর ব্যর্থতা কিন্তু বোঝার ব্যর্থতাতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে এটা মনে রাখতে হবে। এটা কিন্তু বিপজ্জনক। কারণ রাজনীতিতে অনেক সময় পরিবর্তনের প্রকৃত সুযোগ অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। তাই সচেতন প্রক্রিয়ার রূপায়ণই এখানে সব সময় কাম্য।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রেশমা আগুইয়ারকে তার অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

[অসীমা গোয়েল মুম্বই-এর আইজিআইডিআর-এ অধ্যাপনা করেন। অর্থনীতি বিষয়ক বহু বই-এর লেখক নানা গবেষণামূলক কাজের সংগেও যুক্ত। রুলেজ-এর ম্যাক্রোইকোনমিকস অ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স-এর সহসম্পাদক। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং লেকচার। ফুলব্রাইট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো... অসীমা গোয়েল ক্লোরমোন্ট গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি কর্মরত।]

সাধারণ বাজেট

এবারের সাধারণ বাজেট, তার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপট, প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিশদ আলোচনা এই নিবন্ধে। কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মতো মূলগত বিষয়গুলির প্রসঙ্গে বাজেটে কী দিশানির্দেশ রয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন দুই লেখক **চরণ সিং** ও **সারদা শিম্পি**। *রয়েছে বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শও।*

২০১৪ সালের জুলাই মাসে যে সাধারণ বাজেটটি সংসদে পেশ করা হল, তা প্রস্তুত হয়েছে এক কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। বিশ্বজুড়েই, অর্থনীতিগুলি এখনও সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, অর্থনৈতিক বাজারগুলিও পায়নি সুস্থিতি। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ঋণাত্মক সুদের হার ঘোষণা করেছে, আমেরিকা এখনও তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেনি। বিকাশশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও বেশ খারাপ। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির বিকাশের কোনও ঋজু, সুদৃঢ় প্রবণতার সন্ধান মিলছে না। বিশ্বজনীন আর্থিক সংকটের এই প্রভাব থেকে ভারত প্রাথমিকভাবে নিজেকে কিছুটা সুরক্ষিত রাখতে পারলেও ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সালে বিকাশহার নেমে যায় ৫ শতাংশের নীচে। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা—অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই নিম্নমুখী এই প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি ছিল মুদ্রাস্ফীতির চড়া হার। ২০১৩-১৪ সালে পাইকারি মূল্যসূচকের গড় হার ৬ শতাংশে নামলেও তা স্বস্তিদায়ক ছিল না। খাদ্যসামগ্রীর মুদ্রাস্ফীতিও বেশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সোনার আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রভৃতি ব্যবস্থার ফলে ২০১৩-১৪ সালে ভারতের রপ্তানি বাড়ে। এর জেরে চলতি খাতে ঘাটতি জিডিপি-র ৪.৭ শতাংশ (২০১২-১৩) থেকে নেমে আসে ১.৭ শতাংশে (২০১৩-১৪) (চিত্র-১)।

চিত্র-১
চলতিখাতে ঘাটতি (জিডিপি-র শতাংশে)

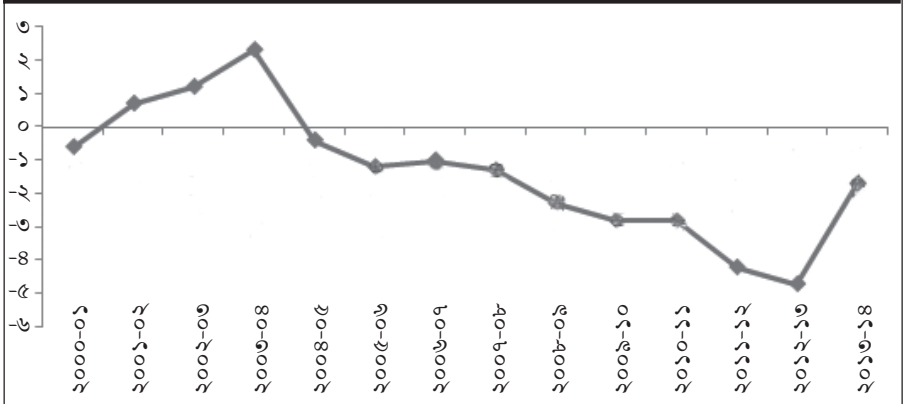

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংক।

আর্থিক মাপকাঠি

ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক শাসনের যে মূলগত নীতি নতুন এনডিএ সরকার নিয়েছে, ২০১৪-১৫ সালের সাধারণ বাজেটেও তা প্রতিফলিত। বাজেটে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণের বোঝা না বাড়ানোর যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, তা অভিনন্দনযোগ্য (সারণি-১)। আগামী ৩-৪ বছর ধরে বিকাশহার ৭ থেকে ৮ শতাংশে সুস্থিত রাখা, চলতি খাতের ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ, রাজকোষ ঘাটতি কমানো এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস এই বাজেটের লক্ষ্য। আর্থিক সংহতিসাধনের পরিকল্পনায় রাজকোষ ঘাটতিকে ২০১৫-১৬ সালে ৩.৬ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ সালে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।

অর্থনীতিতে শ্লথতার প্রভাব ২০১৩-১৪ সালের কর সংগ্রহের ওপরেও পড়ে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়েছে, বর্তমান বছরে ইতিবাচক সংকেতও মিলছে (সারণি-২)। খরচের দিকে দেখলে, প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় একই রয়েছে। জিডিপি-র শতাংশে সুদ বাবদ খরচ কমছে। প্রধানত, খাদ্যসামগ্রীর জন্য ভরতুকি বাবদ ব্যয় কিন্তু বেড়েই চলেছে (সারণি-৩)।

নির্বাচিত কয়েকটি নীতির ঘোষণা

কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর সাধারণ বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়ছে। দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করেন। বাজেটে তাই কৃষিকাজকে প্রতিযোগিতার উপযোগী ও লাভজনক করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিষাণ টেলিভিশন, মজুতঘর পরিকাঠামো তহবিল, মূল্য

স্থিতিকরণ তহবিল, কিষাণ বিকাশ পত্র, নাবার্ডে দীর্ঘমেয়াদি গ্রামীণ ঋণ তহবিল, উচ্চতর উৎপাদানশীলতার ওপর জোর দিয়ে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ইচ্ছাপ্রকাশ—বাজেটের এই সব সংস্থানই কৃষিক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার আন্তরিক প্রয়াস।

আবাসন, নির্মাণ এবং রিয়েল এস্টেট অর্থনৈতিক বিকাশের মূলগত ক্ষেত্র। কর্মসংস্থান ও চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলার ক্ষমতাও এই ক্ষেত্রের রয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিতে বৃহৎ লগ্নি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রী রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্ট এবং পরিকাঠামো বিনিয়োগ ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎসাহদানের কথা ঘোষণা করেছেন। পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে যেহেতু রূপায়ণের সময় অনেক বেশি লাগে এবং প্রভূত সম্পদের প্রয়োজন হয়, তাই এই পদক্ষেপ দেশ-বিদেশের লগ্নিকারীদের আকর্ষণে ও এই ক্ষেত্রের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে আবাসনের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ২০১২ সালের হিসাবে শুধু শহরাঞ্চলেই বাড়ির চাহিদার তুলনায় জোগান প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ কম। বাজেটে আবাসন ও নগর দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রকের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জাতীয় আবাসন ব্যাংকের পরিচালনায় স্বল্প ব্যয়ে আবাসন নির্মাণ মিশন চালু করার কথা বলেছেন।

অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের উপজাত হিসাবে জন্ম নেয় উন্নত জীবনযাপন এবং যথাযথ সুযোগ প্রাপ্তির বাসনা। একশোটি স্মার্ট সিটির গঠন ও এ সংক্রান্ত আধুনিকীকরণের ঘোষণা রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্র এবং সার্বিক পরিকাঠামোর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির জেরে উন্নয়ন হবে টেলিকম ক্ষেত্র এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর।

পণ্য ও পরিষেবা করের আওতাধীন বিষয় নির্বাচনের বিষয়ে নমনীয়তা, এর রূপায়ণকে সহজতর ও দ্রুত করবে। করের হারে সমতা এবং নজরদারির সুবিধা থাকায় কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের কাছেই এটি লাভজনক। পুর ঋণের সুবিধা পাওয়ায় পুরসভাগুলিতে অর্থের জোগান বাড়বে, শক্তিশালী হবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি। স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশ-বাসীর স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ডায়েরিয়ার মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় কমবে শিশুমৃত্যুর হার।

মহিলাদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেটে বেশ কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও যোজনা'-র মতো বিভিন্ন কর্মসূচি সমাজে তাদের পরিসর ও গ্রহণীয়তা আরও প্রসারিত করবে। শিশুকন্যার শিক্ষা সুনিশ্চিত করে পেশাগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে তাদের অবদান রাখার রাস্তা খুলে দেবে এই ধরনের কর্মসূচিগুলি। দেশের শ্রমশক্তির অর্ধেক অংশ শামিল হতে পারবে বিকাশ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়।

সারণি-১
জিডিপি-র শতাংশে ঘাটতি

বৎসর	আরডি	জিএফডি	পিডি
১৯৮০-৮১	১.৪	৫.৭	৩.৯
১৯৯০-৯১	৩.৩	৭.৮	৪.১
২০০০-০১	৪.১	৫.৭	০.৯
২০১০-১১	৩.৩	৪.৯	১.৮
২০১২-১৩	৩.৬	৪.৯	১.৮
২০১৩-১৪ (আরই)	৩.৩	৪.৬	১.৩
২০১৪-১৫ (বিই)	৩.০	৪.১	০.৮

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংক ও সাধারণ বাজেট।

সারণি-২
জিডিপি-র সাপেক্ষে বাছাই করা কয়েকটি আর্থিক মাপকাঠি

বছর	কর বাবদ আয়	সুদ ব্যয়	ভরতুকি	প্রতিরক্ষা
১৯৮০-৮১	৯.১	১.৮	১.৪	২.৫
১৯৯০-৯১	১০.১	৩.৮	২.১	২.৭
২০০০-০১	৯.০	৪.৭	১.৩	২.৩
২০১০-১১	১০.৩	৩.১	২.৩	২.০
২০১২-১৩	১০.৬	৩.৩	২.০	১.৮
২০১৩-১৪ (আরই)	১০.২	৩.৩	২.২	১.৮
২০১৪-১৫ (বিই)	১০.৪	৩.১	২.৬	১.৮

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংক ও সাধারণ বাজেট।

বাজেটের অর্থনৈতিক প্রভাব

বাজেটের প্রভাব খতিয়ে দেখতে আমরা বরং সেই অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বেছে নিই, যেগুলি নিয়ে নির্বাচনের সময়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে—অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং মুদ্রাস্ফীতি। বাজেটে প্রতিটি বিষয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিকাশহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবাসন ও নির্মাণ শিল্পের জন্য বাজেটে যে বিপুল উৎসাহবর্ধক ব্যবস্থার সংস্থান রয়েছে, তার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। আবাসনের সঙ্গে ২৬৯টি শিল্পের যোগ থাকায় এর মাধ্যমে বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে, বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এছাড়া, পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড তো বাড়বেই। সরাসরি কর্মসংস্থান হবে হোটেল, বিনোদন, পরিবহণ ও বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চলতি বছরের ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে সূচনা হচ্ছে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ মিশনের। এর মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষজনের কাছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রযুক্তিনির্ভর এই কর্মকাণ্ডে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে, বহু নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবাদে প্রসারিত হবে অর্থনৈতিক সাক্ষরতার ক্ষেত্র।

বিমাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্তও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। গত এক দশকে সরকারের বহুবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও বর্তমানে সংগৃহীত বিমা মাশুলের পরিমাণ জিডিপি-র চার শতাংশেরও কম। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিমাক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া হলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখন দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম জীবন বিমার আওতায়। ভারতের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যেখানে বিমার আওতা প্রসারিত হলে বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

জাতীয় যুদ্ধ স্মারক, একতা মূর্তি স্থাপনের মতো জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্তের ঘোষণা রয়েছে বাজেটে। এগুলিকে জাতীয় সৌধের মর্যাদা দিয়ে এর মাধ্যমে পর্যটনের প্রসারে উদ্যোগ নিলে বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বাড়বে। নতুন IIT, IIM, AIIMS, কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে প্রতিটি রাজ্যে একটি করে প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্য যুবসমাজের দক্ষতা ও কর্মযোগ্যতা আরও বাড়বে। দেশে এবং বিদেশে তাঁদের কাজের সুযোগও বাড়বে।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতির জন্য আর্থিক নীতির শিথিলতা দায়ী নয়। এর নেপথ্যে যে জোগানের দিকের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব, গত কয়েক মাসে তা আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়েছে। তাই এর মোকাবিলায় মজুতঘর নির্মাণ, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সংস্কার, গণবণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার মতো

সারণি-৩
প্রধান ভরতুকিগুলি

(কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রধান ভরতুকিগুলি	২,৪৭,৪৯৩	২,৪৫,৪৫২	২,৫১,৩৯৭
সার বাবদ ভরতুকি	৬৫,৬১৩	৬৭,৯৭২	৭২,৯৭০
খাদ্যদ্রব্যে ভরতুকি	৮৫,০০০	৯২,০০০	১,১৫,০০০
পেট্রোপণ্যে ভরতুকি	৯৬,৮৮০	৮৫,৪৮০	৬৩,৪২৭
সুদ বাবদ ভরতুকি	৭,২৭০	৮,১৭৫	৮,৩১৩
অন্যান্য ভরতুকি	২,৩১৬	১,৮৯০	৯৪৭
মোট ভরতুকি	২,৫৭,০৭৯	২,৫৫,৫১৬	২,৬০,৬৫৮

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংক ও সাধারণ বাজেট।

পদক্ষেপের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর জেরে কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।

নীতিগত পরামর্শ

এই বাজেটে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সকলের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়েছে এতে। এগুলি হল—

(ক) খাদ্যদ্রব্যে ভরতুকির ক্ষেত্রে সেই ভরতুকি যাতে দরিদ্র মানুষের কাছে যথার্থই পৌঁছোয় তা সুনিশ্চিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা আরও বাড়াতে হবে। স্থানীয় স্তরে প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও তথ্য কাজে লাগানো দরকার।

(খ) কিষাণ বিকাশ পত্র ফের চালু করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এর আগে দেখা গেছে, কৃষক নন, এমন বহু ব্যক্তি কিষাণ বিকাশ পত্রের সুবিধা নিয়েছেন। এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য এর কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

(গ) অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ মিশনে পরিবার পিছু দুটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং প্রাথমিকভাবে কিছু অর্থ ঋণ দেবার কথা ভাবা হয়েছে, তাতে ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা মানুষজন এর অন্তর্ভুক্ত হবেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে একটা বিপদ থেকে যাবে। প্রত্যেকের কাছে এখনও স্বতন্ত্র পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা না পৌঁছনোয়, ঋণের অর্থ যাতে নয়ছয় না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

(ঘ) গণবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের সঙ্গে এর মাধ্যমে নতুন ধরনের দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেশের পাঁচ লক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সাবান, অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র, মশারির মতো সামগ্রী বিক্রি করা যায়।

(ঙ) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSR) পালনের জন্য সংস্থাগুলি যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে লাগানো যায়। কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুসারে নির্দিষ্ট কোম্পানিগুলির মুনাফার ২ শতাংশ সামাজিক দায়িত্ব পালনে খরচ করা বাধ্যতামূলক। যে সব কোম্পানির নেট সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি অথবা বিক্রয়ের পরিমাণ বছরে ১০০০ কোটি টাকা বা নেট মুনাফা বছরে ৫ কোটি টাকা, তাদের ক্ষেত্রে এই সংস্থান প্রযোজ্য। সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত। কোম্পানি নিজের উদ্যোগে অথবা অমুনাফাভোগী কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজ করতে পারে। শিল্পমহলের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৬ হাজার কোম্পানি সামাজিক দায় পালনের আইনি আওতার মধ্যে পড়ে। এজন্য নির্দিষ্ট অর্থের আনুমানিক পরিমাণ ২০ হাজার কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যাতে দেশ গঠনের কাজে

সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করতে সরকার এ সংক্রান্ত একটি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা ভাবতে পারে।

(চ) পাহাড়প্রমাণ Non-performing Asset বা ঝুটো সম্পত্তির প্রেক্ষিতে সরকার অতিরিক্ত ঋণ আদায় ট্রাইবুন্যাল (ডিআরটি) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রাইবুন্যালগুলিকে শক্তিশালী ও আরও কার্যকর করে তুলে অনাদায়ি ঋণ আদায়ের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ডিআরটি কেবল গ্রাহকদের স্বার্থই দেখে এবং ঋণ আদায়ে তেমন উপযোগী হয় না—এমন একটা ধারণা ব্যাংকিং ক্ষেত্রের রয়েছে। তার বদল ঘটানো দরকার।

(ছ) নতুন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা আরও শক্তিশালী হবে যদি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। ভারত থেকে বহু যুবক-যুবতী বিদেশে গিয়ে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে স্বল্প বেতনের কাজ করতে বাধ্য হন। সরকার দেশে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করে এঁদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। যেসব দেশে মানবসম্পদের অভাব রয়েছে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ভারতে কেন্দ্র স্থাপন করে আমাদের যুবশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে। এরপর দক্ষ এই মানবসম্পদ ওইসব দেশে কাজ করতে পারবে। এরা একদিকে যেমন বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে, তেমনি দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা উপার্জনে সহায়ক হবে।

উপসংহার

প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে একজন কুশলী চিন্তাবিদ এবং পোড় খাওয়া সাংসদের নেতৃত্বে প্রস্তুত এই সাধারণ বাজেটে সর্বাধিক সহযোগিতা ও ন্যূনতম সংঘাতের বাস্তবোচিত নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নীতিই সম্ভবত সর্বাধিক শ্রেয়।

চলতি খাতে ঘাটতি ক্রমশ বেড়ে চলায় সাম্প্রতিককালে সোনা আমদানির ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং স্বর্ণবাজারের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগ নেওয়ার। তবে সোনা নিয়ে এই বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। অর্থমন্ত্রী সোনা নিয়ে সরকারের নীতিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করতে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারতেন।

জনসংখ্যার একটি অংশ, প্রবীণ নাগরিকরা, সরকারের অধিকাংশ নীতিতেই উপেক্ষিত থাকেন। ভারতে ১১ কোটিরও বেশি মানুষের বয়স ৬০ বছরের বেশি। এঁদের মধ্যে বিশেষত মহিলাদের যত্ন অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ তাঁদের প্রায় ৯০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে সামাজিক সুরক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেই। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা প্রায় ৩ কোটি প্রবীণ মানুষ ৫০০ টাকা করে পেনশন পান, বাকি ৮ কোটি বয়স্ক এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জনস্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্বল ও অপ্রতুল হওয়ায় এঁরা চিকিৎসার সুযোগও বিশেষ পান না বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে জিডিপি-র ৮ থেকে ১০ শতাংশ প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য খরচ করা হয়, সেখানে ভারতে এই পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সার্বজনীন পেনশন ও সার্বজনীন বিমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা জীবনের শেষ পর্বটি মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন। সার্বজনীন এই পেনশনের পরিমাণ বয়সের সঙ্গে বাড়ানো যেতে পারে। আরও দুটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য একটি স্বতন্ত্র 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' গঠন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, বার্ধক্যবিজ্ঞান নিয়ে অনেক বেশি চর্চা হওয়া দরকার, যা এদেশে চিরকালই অবহেলিত হয়ে এসেছে।

নতুন সরকারের প্রথম সাধারণ বাজেটকে আপাতদৃষ্টিতে পূর্ববর্তী সরকারের আর্থিক নীতিরই অনুসরণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এখানেও নতুন অনেক কিছু আছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা এবং ভারতীয় নীতি প্রণয়ন ও ব্যবসায়িক চিন্তাধারাকে পালটে দেবার ক্ষমতা এই বাজেটের রয়েছে। প্রয়োজন এর সঠিক রূপায়ণের।

অর্থমন্ত্রী সংগতকারণেই বাজেটকে রহস্যের আবরণে আবৃত রাখেননি। অনেক দেশেই বাজেটের দিন আর পাঁচটা দিনের মতোই। আর্থিক নীতি সেখানে ধারাবাহিকভাবে প্রণয়ন করা হয়। অর্থমন্ত্রীও এবার জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং অপুষ্টি মোকাবিলার মতো কল্যাণমূলক বিষয়গুলি পৃথকভাবে দেখা হবে। ভরতুকি হ্রাসের মতো পদক্ষেপ নিয়ে সরকারি খরচ কমিয়ে আনার বিষয়ে বিবেচনা করতে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত বোঝায়, অর্থমন্ত্রী স্বল্প সময়ের মধ্যে বাজেট প্রস্তুতিতে আর্থিক বিষয়গুলি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখেছেন। ঋণের বোঝা কমানোর প্রয়াস বোঝায়, অর্থমন্ত্রী আর্থিক সংহতিসাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই বাজেট তাই প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসার দাবি রাখে। প্রথাবিরোধী এই বাজেট সহমতের ভিত্তিতে বহু সংস্কারের সূচনা করবে।❑

[ড: চরণ সিং ব্যাঙ্গালোর-এর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব ম্যানেজমেন্ট-এ আরবিআই চেয়ার প্রফেসর। ইতিপূর্বে তিনি আইএমএফএ সিনিয়র ইকনমিস্টস হিসেবে কাজ করছেন। শারদা সিম্পি আইআইএমবি-তে রিসার্চ অ্যাসেসিয়েট]

নিরস প্যাকেজিং-এ সরস বাজেট

নতুন সরকারের পয়লা বাজেট। তৈরির জন্য সময় মিলেছে মাত্র ৪৫টি দিন। রাজস্ব ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। অর্থনীতিতে ডামাডোল। এসবের মাঝে বিকাশের হার চাঙা করার পথ দেখানো চাট্টিখানি কথা নয়। সীমিত সময় সত্ত্বেও বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এককথায়, বাজেটে মুনশিয়ানার ছাপ যথেষ্ট। বাজেটের প্যাকেজিং ও উপস্থাপনা নিয়ে সেকথা বলা যাচ্ছে কই।—**রবীন্দ্র এইচ ঢোলাকিয়া।**

এই বাজেট মূলত চলতি অর্থ বছরের বাদবাকি আট মাসের জন্য। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে পেশ করা অন্তর্বর্তী বাজেট থেকে আমূল রদবদলের সুযোগ এতে খুব একটা ছিল না। তবে কিনা এ সরকারের প্রথম বাজেট ঘিরে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। অর্থনীতিবিদ ও অর্থসংক্রান্ত বিশারদরা অবশ্য জানতেন বিগত সরকারের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের দরুন অর্থমন্ত্রীকে বাধার পাহাড় সামলাতে হচ্ছে। এছাড়া, শিক্ষা, রোজগারি ও খাদ্য নিরাপত্তার অধিকার দিয়ে আগের জমানায় বেশ কিছু আইন পাশ হয়েছিল। এসব আইন আগাগোড়া ফের খতিয়ে দেখে তার ছক এবং কর্মসূচি রূপায়ণে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীর এক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল আনার ক্ষমতা সীমিত। আমাদের সংসদীয় ও আইনি ব্যবস্থায় একাজ সময়সাপেক্ষ। চলতি বাজেটে এসব অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার এবং রদবদল আনার পক্ষে ৪৫ দিন অকিঞ্চিৎকর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব ব্যাপারে তড়িঘড়ি অযথা ঝুঁকি নেবার চাইতে ধীরে-সুস্থে পা ফেলাই ভালো।

এ সরকারের পাঁচটি বাজেট পেশ করার কথা। এটি পয়লা। এ বিষয় মাথায় রেখে এবারের বাজেট খতিয়ে দেখা এবং তার মূল্যায়ন করা দরকার। হালফিল এবং পরিবর্তনশীল যে আর্থনীতিক পরিবেশের মাঝে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার কথা মনে রেখেও বাজেটের ভালোমন্দ বিচার করতে হবে। কারণ, এই পরিবেশ বাজেটের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের দিশা ঠিক করে দেয়।

আর্থনীতিক পরিবেশ ও বাজেট অগ্রাধিকার

অর্থনীতির হালচাল নিয়ে গত দুবছরে চর্চা হয়েছে বিস্তর। এসময় সার্বিক বিকাশ হার নেমে দাঁড়ায় ৪.৫ এবং ৪.৭ শতাংশ। এ দুবছর অবশ্য, কৃষির গড় বিকাশহার ছিল ৩ শতাংশের মতো। এটা মন্দ বলা চলে না। খনি শিল্পে অবশ্য বিকাশহার ছিল ঋণাত্মক। উৎপাদন এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে বিকাশ হার ছিল থমকে। বাণিজ্য ও পরিবহণ ক্ষেত্রে বিকাশহার অনেকটা নেমে যায়।

ক্রেতা মূল্য সূচকে চড়া মুদ্রাস্ফীতি ছিল নাছোড়বান্দা। মানুষ ভাবতে থাকে অর্থনীতি স্ট্যাগফ্লেশন বা 'নিশ্চলতা-মুদ্রাস্ফীতির' ফাঁদে পড়েছে। এই অবস্থায় অর্থনীতিতে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও রোজগার বাড়ে না, অথচ মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকে। চলতি খাতে ঘাটতি (সিএডি) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩ শতাংশের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ঘাটতি কিন্তু সেই লক্ষণরেখা ছাড়িয়ে যায়। আমদানি হ্রাস ও রপ্তানিতে স্থিতাবস্থার দরুন গত বছর অবশ্য ঘাটতি নেমে দাঁড়ায় ১.৭ শতাংশ।

বিকাশহার অনেকটা কম। রপ্তানি-সহ অর্থনীতির বেশিরভাগ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড থমকে। এসবের মোদ্দা ফল, বেকারি বাড়বে। দক্ষ এবং অদক্ষ দুশ্রেণির শ্রমিকের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। হিসেব করে দেখা গেছে উৎপাদন বৃদ্ধি ১ শতাংশ পয়েন্ট কমলে কর্মসংস্থান ০.১৮ শতাংশ পয়েন্ট মার খায়। আর গরিব লোকের সংখ্যা বাড়ে ০.১৯ শতাংশ পয়েন্ট। সোজাসাপটা কথায়, বিকাশ ১ শতাংশ পয়েন্ট কমলে রুজি-রোজগার খোয়াবে লাখ বাইশেক মানুষ। সেই সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক মানুষকে ঠেলে দেবে গরিবি-রেখার নীচে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন ভোগান্তি বেশি গরিবদের।

বিকাশে মদত এবং গরিবি কমানোর লক্ষ্যে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে সরকারের হাত-পা বাঁধা। জনপ্রিয় অথচ অনুৎপাদনশীল পদক্ষেপের দরুন রাজকোষে টানাটানি। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি তখনকার অর্থমন্ত্রী রাজস্ব আয়-ব্যয়ে শৃঙ্খলা ফেরাবার এক লক্ষ্য ধার্য করেছিলেন। এই লক্ষ্যের ভিত্তি কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে পূর্বসূরির সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা ছাড়া নান্য পন্থাঃ। বিকাশহারে মন্দার দরুন কর্মসংস্থান হ্রাস ও গরিবি বাড়ায় সমাজকে তা সামলাতে চড়া গুনাগার দিতে হচ্ছে। রাজস্ব আয়-ব্যয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং তার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা কমাতে অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক বিকাশ বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে লগ্নিকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ব্যক্তিগত, কর্পোরেট ও সরকারি সংস্থায় আরও সঞ্চয় মারফতই তা একমাত্র সম্ভব।

বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা

এই সরকারের প্রথম বাজেট ঘিরে সংশ্লিষ্ট সব মহলে প্রত্যাশা আদিগন্ত। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, লগ্নিকারী ও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট

রেটিং সংস্থার আশা ভবিষ্যৎ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশদ দিশা মিলবে। বিকাশহার বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি রোখার দাওয়াই বাতলাবে বাজেট। নীতি কাঠামোয় স্থিরতা বজায় রাখবার অঙ্গীকার। সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। সরকারের কর আয়-এর মোটা অংশটা জোগায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারা চায় করের বোঝা কিছু কমুক।

বাজেটে ২০১৩-১৪-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। যদিও বাজেট তৈরির জন্য যে কোনও অর্থমন্ত্রীর কাছে এই সমীক্ষা এক পথপ্রদর্শক নথি বলে ধরা হয়। প্রাক্-বাজেট পর্বে ভারতীয় অর্থনীতির শক্তিসামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে এই সমীক্ষা। নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ায় সংস্কারের জন্য স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশলও বাতলায়। সমীক্ষায় এসব যাবতীয় উপকরণ জোগানো হয়েছে। যদিও সমীক্ষা যথেষ্ট সচেতন যে পয়লা বাজেটেই সব মুশকিল আসান করা যায় না। আগামী পাঁচ বছরে উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য সমীক্ষায় সরকারকে পথ দেখানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী টানা দু'ঘণ্টা বাজেট ভাষণ দেন। দু'তিনটে বাড়তি বাক্য জুড়ে সমীক্ষায় বাতলানো পথ মেনে চলতে তাঁর সরকারের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরলে যাবতীয় খামোখা সমালোচনা এড়াতে পারতেন।

খোলাখুলি উল্লেখ ছাড়াই অবশ্য অর্থমন্ত্রী সমীক্ষার বেশ কিছু মতামত মেনে নিয়েছেন। সমীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে নীতিগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রটি উদারভাবে ব্যাখ্যা করলে, ভবিষ্যৎ সংস্কারে বিশদ দিশা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্বচ্ছ। সমীক্ষায় স্পষ্ট বলেছে আইন, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ায় বদল আনা দরকার। এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যা বা যোজনার তত্ত্ব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলতে হবে। উদার বাজার ভিত্তিক দর্শন বা তত্ত্বের সঙ্গে লাগসই ছাড়া কোনও কাজকর্ম হাতে নেওয়া চলবে না। বাজারের ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরাতে নিষিদ্ধ না হলে যে কোনও কর্মকাণ্ডে সায় মিলবে। অর্থনীতি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় রদবদলের ক্ষেত্রে এই থিম এবং তার গুরুত্ব সমীক্ষায় খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নীতি কাঠামো বিশেষত কর নীতি স্থিতিশীল রাখার, আশ্বাস অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি নেহাত কোনও নীতি পরিবর্তন করা হলেও তা অতীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। নীতি পঙ্গুতার আগল ভাঙতে সরকার ঝটিতি ব্যবস্থা নিয়েছে। বহুদিন ঝুলে থাকা প্রকল্প অনুমোদনে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক বিকাশ ফের চাঙ্গা করতে সরকারের অঙ্গীকারের ইঙ্গিত দিয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেটে কয়েকটি ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন।

অর্থনৈতিক বিকাশ ফের চাঙ্গা করতে তোড়জোড়

সঞ্চয় মারফত পাওয়া বিনিয়োগ অর্থাৎ আরও মূলধনের নিপুণ ও সদ্ব্যবহার করে পাওয়া বাড়তি উৎপাদন হচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশ। এই বাড়তি মূলধনের উৎপাদনশীলতা মাপা হয় 'আইকর' বা ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও দিয়ে। এই রেশিও থেকে বোঝা যায় এক ইউনিট বাড়তি উৎপাদনের জন্য কী পরিমাণ লগ্নি বা বিনিয়োগ দরকার। ২০০৯-১১-এ আমাদের লগ্নির হার ছিল ৩৬.৭ শতাংশ। আর বিকাশহার গড়ে ৯ শতাংশ। সুতরাং, আইকর ৪.১। মোদ্দাকথায়, ৪.১ শতাংশ লগ্নির মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে ১ শতাংশ। আগের বছরগুলোতে আমাদের বিকাশহার ছিল ৮-৯ শতাংশ। আইকর মোটামুটি ৪-৪.১ শতাংশ। গত তিন বছর আমরা ভুগছি নীতিপঙ্গুতায়। উৎপাদনক্ষমতা সদ্ব্যবহারে খামতির দরুন আইকর বেড়ে যায় অনেকখানি। ফলে, লগ্নির হার ৩৪-৩৫ শতাংশ চলতে থাকলেও বিকাশহার ঝপ করে নেমে দাঁড়ায় ৪.৫-৬ শতাংশ।

কালবিলম্ব নয়। আর সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। আইকর কমানোর চাবিকাঠি এটাই। লগ্নির হারে হেরফের না হলেও এর ফলে বিকাশ হার বাড়বে চটপট। সঞ্চয়ে উৎসাহ জুগিয়ে বিকাশ হার যথেষ্ট বাড়ানোর জন্য বাজেট ব্যবস্থা নিয়েছে। কর ছাড়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি কিছু ইনসেনটিভ দিয়ে কর্পোরেট ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করা হয়েছে। ব্যয়ে আরও শৃঙ্খলা, উন্নত শিল্প-ব্যবসায় পরিবেশ, ভরতুকি কমানো ও আয় বাড়ানোর জন্য কিছু কড়া দাওয়াই দিয়ে সরকারি সংস্থাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সঞ্চয় বাড়লে লগ্নির জন্য অর্থের জোগান বৃদ্ধি পাবে। কমবে সুদের হার। রাজকোষ ঘাটতি কমানোর চ্যালেঞ্জিং টার্গেট বা লক্ষ্য অর্জনে বাজেট বদ্ধপরিকর। এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল লগ্নির জন্য আরও বেশি অর্থ মিলবে। ফলে কমবে চড়া সুদের চাপ। দেশি-বিদেশি লগ্নি উৎসাহ পাবে। স্থায়ী নীতি কাঠামো ও অতীত থেকে কার্যকর হবে এমন কোনও নীতি চালু না করার সরকারি প্রতিশ্রুতি তো আছেই। এতে লগ্নিকারীদের মনে নীতি সংক্রান্ত ঝুঁকি কমবে। লগ্নির জন্য বাড়বে তাঁদের আগ্রহ।

একইসঙ্গে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঘোষণা করা হয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশে জোয়ার আনার লক্ষ্যে। সাড়ে আট হাজার কিলোমিটার পথঘাট তৈরি ও একশো স্মার্ট সিটি গড়া হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) প্রকল্পে ছাড়পত্র, কয়লার জোগান বৃদ্ধি, বস্ত্র, রিয়্যাল এস্টেট, গুদাম, মাঝারি-ক্ষুদ্র-অতি ক্ষুদ্র শিল্প, জাহাজ, বিমানবন্দর, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ব্যাংক, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন ও পর্যটনে ইনসেনটিভ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার মাধ্যমে বিকাশ বাড়বে।

মুদ্রাস্ফীতি বাগে আনা

ভারতে ইদানীং ভোগ্যপণ্যে দাম চড়ার জন্য জোগান কম থাকাই মূলত দায়ী। বিশেষত খাদ্যদ্রব্য। ফল, শাকসবজি, দানাশস্যের অপচয় রুখতে আরও গুদাম তৈরির জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। কৃষিপণ্য কমিটি সংস্কারের ও অঙ্গীকার আছে। ফসল বেচার ক্ষেত্রে চাষিদের কাছে আরও বেশি পছন্দ বা বাদবিচারের সুযোগ এনে দেওয়া এর লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রস্তাবের সঙ্গে এই অঙ্গীকারের মিল আছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার সুপারিশের সঙ্গে এটা মানানসই। বাজেটে এবং বাজেটের বাইরে নেওয়া ব্যবস্থাদির দরুন বিকাশহার চলতি

৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬ শতাংশে দাঁড়াবে। বাজেট এটাই হিসেব করে দেখেছে। হয়তো হিসেবটা একটু কমসম করে ধরা হয়েছে। তবে এই অর্থ বছরে আর মাত্র মাস আটেক বাকি। তাই কম করে ধরা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। বিকাশহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাড়লে জোগানের ঘাটতি অনেকটা মিটে যাবে। জিনিসপত্তরে দাম পড়বে।

এরপর ইস্যু হচ্ছে মোট চাহিদা নিয়ন্ত্রণ। অমূলক হলেও ভারতে দস্তুর এটাই যে এর একমাত্র দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের। পরিস্থিতি সামলাতে সুদের হার বাড়ানোর জন্য তারা ব্যগ্র থাকে। আসলে মোট চাহিদার সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে কিন্তু সরকারের রাজস্ব নীতি। আগের ১৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে এ বাজেটে সরকারের ব্যয় নামানো হয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৩.৭ শতাংশে। এর দরুন বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ার মওকা মিলেছে। কর ছাড়ের ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পাশাপাশি ভোগ ও লগ্নি বাড়বে। রাজকোষ ঘাটতি ৪.৬ থেকে ৪.১ শতাংশ কমায় মোট চাহিদা না বেড়ে বরং কমের দিকে যাবে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমবে যথাসময়ে।

রাজস্ব আয়ব্যয়ে সুব্যবস্থা

যে কোনও বাজেটে এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর চলতি বাজেটের পক্ষে একথা আরও বেশি খাটে। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের চোখে ভারতের অর্থনীতি বিশৃঙ্খল। তাঁদের গড়া এই ধারণা থেকে অর্থনীতিকে বের করে আনার জন্য সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ক্ষমতা নির্ভর করছে রাজস্ব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে। এফআরবিএম (ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট) আইনে ধার্য সংশোধিত টার্গেট বা লক্ষ্য অর্জনে রাজস্ব ব্যবস্থা জোরদার করার পথে অর্থমন্ত্রীর অবিচল থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। মোট রাজস্বের হিসেব ও সেই লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকার করার জন্য এ আইনে তিন বছরের বহতা পরিকল্পনা বা রোলিং প্ল্যান তৈরির সংস্থান আছে। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী বাজেটে এই পথের ছক কষা হয়। তবে সুস্পষ্ট কারণে এই প্রচেষ্টার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না। যদিও অন্তর্বর্তী বাজেটের টার্গেটে কড়া রাজস্ব শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছিল। নতুন সরকারের কাছে এটা এক দস্তুরমতো চ্যালেঞ্জ। আর অর্থমন্ত্রী এই চ্যালেঞ্জ নেবার হিম্মত দেখিয়েছেন।

তিন বছরের রোলিং প্ল্যানে রাজস্ব টার্গেটে সরকারের কিছু নীতি সিদ্ধান্ত এদেশে সুযোগের হিসেবনিকেশ কষতে শিল্প-বাণিজ্য মহল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের সাহায্য করবে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

অর্থমন্ত্রীর নেওয়া রাজস্ব চ্যালেঞ্জ তাঁর দলের রাজনৈতিক দর্শন বা তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই তত্ত্ব ছোট সরকার অথচ দক্ষ ও বেশি শাসনে আস্থাশীল। রাজস্ব ক্ষেত্রে সরকার কতটা জড়িত তা সাধারণত হিসেব করা হয় মোট অভ্যন্তরীণ ও রাজস্ব ব্যয়ের অনুপাত থেকে। সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে এই অনুপাত ক্রমশ কমবে। সরকারি ব্যয় কমা মানেই পরিষেবায় কাটছাঁট, ভাবাটা ঠিক নয়। কেননা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রকে জোড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনাবশ্যক সরকারি ব্যয় কমিয়ে সে জায়গায় বেসরকারি ব্যয়ের সুযোগ করে দিতে সরকার তার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে এভাবে।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে মোট কর রাজস্ব ২০১৩-১৪-এর ১০.২ শতাংশ থেকে ২০১৬-১৭-তে ১১.২ শতাংশ বাড়বে। এজন্য কর হার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী নয়। পরিষেবা ও সাইবার কর ভিত্তি বাড়িয়ে অর্থাৎ আরও বেশি মানুষকে এর আওতায় এনে এবং কর আদায় ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সম্ভাবনা বেশি। অর্থমন্ত্রীর কমসম করে দেখানো হিসেবের চেয়ে আর্থনীতিক বিকাশ বেশি হলে বাড়তি সম্পদ ব্যয় না করে

সারণি-১
চলতি বাজার দামে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে মোট রাজস্ব আয়-ব্যয়

দফা	২০১৩-১৪ (সংশোধিত হিসেব)	২০১৪-১৫ (বাজেট হিসেব)	২০১৫-১৬ (টার্গেট)	২০১৬-১৭ (টার্গেট)
মোট কর রাজস্ব	১০.২	১০.৬	১০.৯	১১.২
নিট কর রাজস্ব	৭.৪	৭.৬	৭.৪	৭.৬
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭	১.৪	১.৪	১.২
মোট ব্যয়	১৪.০	১৩.৭	১৩.১	১২.৫
ভরতুকি	২.৩	২.০	১.৭	১.৬
রাজস্ব ঘাটতি	৩.৩	২.৯	২.২	১.৬
মূলধনি সম্পদের জন্য অনুদান	১.৩	১.৩	২.২	১.৬
প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি	২.০	১.৬	২.২	১.৬
বিলগ্নীকরণ + ঋণ উদ্ধার	০.৩	০.৬	০.৭	০.৭
রাজকোষ ঘাটতি	৪.৬	৪.১	৩.৬	৩.০
ঋণ/মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৪৬.০	৪৫.৪	৪৩.৬	৪১.৫

উৎস : মিডিয়াম টার্ম ফিসক্যাল পলিশি স্টেটমেন্ট অ্যান্ড বাজেট অ্যাট এ গ্লান্স থেকে হিসেব।

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আরও কিছু ছাড় দেবার আশ্বাস মিলেছে। কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যে হিসেব অর্থমন্ত্রী করেছেন তা আদৌ অমূলক নয়। আগের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় এই হিসেব যথেষ্ট যুক্তির ধার ধারে।

ঋণ বাবদ সুদের পাশাপাশি ভরতুকি খাতে খরচও খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব শৃঙ্খলায় রাজকোষ ঘাটতি কমতে থাকবে। তাই ঋণ—মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-এর অনুপাত যথেষ্ট কমতে বাধ্য। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা একবার কমলে সরকার কম সুদে ঋণ পাবে। কম সুদের হার এবং ঋণ—মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাতের দরুন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে সুদ খাতে খরচ ক্রমশ কমবে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় এক মস্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে ভরতুকি। ভরতুকি জোগাতে খরচ হয় ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা গিলে নেয় খাদ্যশস্য, সার ও পেট্রোপণ্য। পেট্রোপণ্য ভরতুকিতে ২০১৩-১৪-এ খরচ ৮৫,৪৮০ কোটি। ২০১৪-১৫-এ এই ভরতুকি কমে হবে ৬৩,৪২৭ কোটি টাকা। অন্য দু'পণ্যে ভরতুকি কিঞ্চিৎ বাড়তে পারে। পরের বছর ভরতুকি কমবে ৪ শতাংশ এবং তারপর ৫ শতাংশ। এর ফলে ভরতুকি ব্যয় ২০১৩-১৪-এ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬-১৭-তে হবে ১.৬ শতাংশ। এই লক্ষ্য পূরণে চলতি বাজেটে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা কমিশন গড়ার প্রস্তাব আছে।

রোলিং প্ল্যানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ থেকে জিরো এফেকটিভ রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্য। সংশোধিত এফআরবিএম-এর টার্গেট কার্যকর রাজস্ব ঘাটতি ভিত্তিক। মূলধনি সম্পদ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া অনুদান বাদ দিয়ে এর হিসেব করা হয়। মূলধনি সম্পদ সৃজনে অনুদান এ বছরের ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে আগামী বছর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.২ শতাংশে নিয়ে যাবার লক্ষ্য আছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মতো কর্মসূচিতে ভোগমুখীনতা ছেড়ে উৎপাদনশীল মূলধনি সম্পদ সৃষ্টির দিকে গুরুত্ব দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে।

শেষকথা

এবারের বাজেট আদতে এক চ্যালেঞ্জের কর্মকাণ্ড। মাত্র ৪৫ দিনে বাজেট তৈরির কাজ সারতে হয়েছে শুধুমাত্র এজন্য নয়। রাজস্ব ও বৃহত্তর অর্থনীতির অরাজকতা থেকে দেশকে ঠেলে তোলার জন্যও বটে। বর্তমান অবস্থায় অর্থনীতির প্রয়োজনকে ভিত্তি করে অর্থমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া টার্গেট পূরণের জন্য বাজেটে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আছে। তার প্রথম বাজেটে, কপালদোষে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবগুলি ঠিকমতো প্যাকেজিং ও উপস্থাপন করতে পারেননি। এই সরকারের নীতির ভবিষ্যৎ দিশা ও পথনির্দেশিকার জন্য অর্থনৈতিক সমীক্ষার মতামত তাঁর তুলে ধরা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। ফলে তাঁর দূরদর্শিতা বা ভিশন এবং ভবিষ্যৎ দিশায় স্বচ্ছতার অভাব আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ব্যাপারটা আদপেই সত্যি নয়। তিনি বরং সমীক্ষার বেশ কিছু পরামর্শ বাজেটে ঠাঁই দিয়েছেন। সমীক্ষার কথা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেননি।

রাজস্ব ক্ষেত্রকে মজবুত করার জন্য বাজেট ও রোলিং প্ল্যানের সার্বিক সদর্থক প্রভাব গড়বে লগ্নির মনোভাব, শিল্প-ব্যবসায় পরিবেশ, বিকাশের পুনরুদ্ধার এবং মুদ্রাস্ফীতি দমনের ওপর। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি লগ্নির দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই বাজেট যথেষ্ট সদর্থক মনে করবে। অর্থনীতি চাঙ্গা হলে (যার সম্ভাবনা খুব বেশি) এজেন্সিগুলি ভারতের রেটিং বাড়াবে এ সম্ভাবনা যথেষ্ট।❑

[প্রফেসর রবীন্দ্র ঢোলাকিয়া আহমেদাবাদ-এর ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটুট অব ম্যানেজমেন্ট-এ অধ্যাপনা করেন। ষষ্ঠ পে-কমিশন-এর সদস্য ছিলেন।]

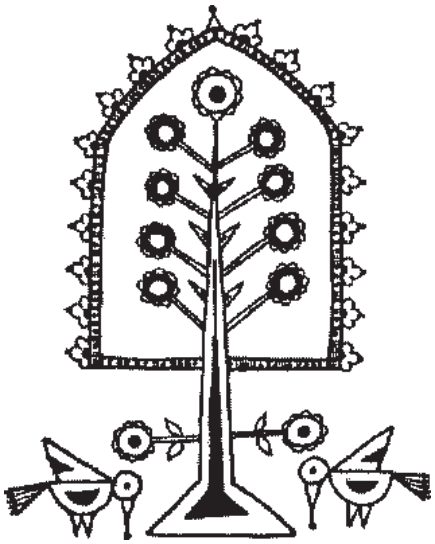

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

রেল বাজেট কি এবার কিছুটা বাস্তবমুখী

রেলের হাল বাস্তবিকই উদ্বেগজনক। খোদ মন্ত্রী রেল বাজেটে তা কবুল করেছেন। এবার বাজেটে সমস্যাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এক গুচ্ছের প্রস্তাব আছে। সংস্থার আর্থিক কাঠামো জোরদার করার জন্য এ নিবন্ধে মাশুল নীতি নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা আছে। কিছু প্রস্তাবের তারিখ করলেও বুলেট প্রকল্প নিয়ে মাতামাতির বিরুদ্ধে নিবন্ধকার **এস শ্রীরমণ** *সরব। বেসরকারিকরণ বা রেলকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনে পরিণত করা নিয়ে আছে তাঁর মতামত। সবশেষে, নিবন্ধের রায় বাজেটের ভিশন বাস্তবায়িত করতে অবিলম্বে চাই এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা।*

২০১৪-র রেল বাজেট নিয়ে মিশ্র সাড়া মিলেছে। একদিকে সুভাষিত বুলি—শুরুয়াতটা তো মোটামুটি ভালোই। বাস্তবের পথে চলার সংকেত দিচ্ছে। সঠিক দিশায় জোর কদম। পক্ষান্তরে নির্লিপ্ত সুরে গরিবদের জন্য আদৌ কোনও ভাবনাচিন্তা করা হয়নি, এহেন মন্তব্যও শোনা গেছে বইকি। এপক্ষের দাবি, আগের বিশেষত গত দশকে বহু বাজেট ছিল গরিব-দরদি। বাজেট ও তার প্রস্তাবগুলি নিয়ে ছোটখাট এই পর্যালোচনায় দু' তরফের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হবে। মন্ত্রীর জবানি—রেলের বর্তমান হাল এক কড়া চ্যালেঞ্জ। গোড়াতে তাঁর এই উক্তি নিয়ে কাটাছেঁড়ার পর বাজেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

এক দশকের মধ্যে বলতে গেলে এই প্রথম বাজেটে রেলের প্রকৃত সমস্যাগুলি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বাজেট কবুল করেছে আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেল যোগাযোগের তেমন একটা সুব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। বিশেষত দূরপাল্লায় লটে বা বহু পরিমাণ মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে একথা বেশি খাটে। কোনওরকম রাখঢাক না করে বলা হয়েছে এটা এক মস্ত চ্যালেঞ্জ—নীতি প্রণেতাদের গোচরে আগে বারংবার আনা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সাড়া পাওয়া উচিত। চাই সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য। সোজা কথায়, বাজেটে এ বাবদ বাড়তি অর্থবরাদ্দ দরকার। আদতে বেশ কিছু বছর অর্থবরাদ্দ কমছে। রেলের অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব উদ্বৃত্ত জোগাড়েও জোর দেওয়া হয়েছে। তবে কিনা এক যুক্তিসংগত যাত্রী ভাড়া ও পণ্য মাশুল স্ট্র্যাটেজি বা নীতি রূপায়ণের অভাবে তা কখনওই গুরুত্ব পায়নি। এব্যাপারে নীচে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

রেলে এক যুক্তিসংগত মাশুল নীতি না থাকা একটা বড় বিষয়। এখন প্রশ্ন : যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গি কী? রেলের মতো মাল্টি-প্রডাক্ট সংস্থায় দাম ধার্যের ক্ষেত্রে নীতিপ্রণেতারা দীর্ঘদিন যাবৎ বেশ কিছু ইস্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। শিল্পের মৌল অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য থেকে অনিবার্যভাবে এসব ইস্যু উঠে আসে। ইকনমিজ অব স্কেল ও স্কোপ থেকে বোঝা যায় শুধুমাত্র খরচের পরিমাণ দাম নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না। ইকনমিজ অব স্কেল বুঝিয়ে দেয় যে মার্জিনাল কস্ট প্রাইসিং বা প্রান্তিক ব্যয় দাম সংস্থাকে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যে পৌঁছে দেবে না। আবার ইকনমিজ অব স্কোপ-এর সহচর শেয়ারড্ কস্টকে কোনও নির্দিষ্ট প্রডাক্টের সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্নিত করা চলে না। তাই নির্দিষ্ট প্রডাক্টের সঙ্গে শেয়ার কস্টকে সংযুক্ত করার জন্য কোনও নিয়ম ঠিক করা অযৌক্তিক হবে। পুরোপুরি ডিসট্রিবিউটেড বা অ্যালোকেটেড কস্ট হিসেবে এহেন অযৌক্তিক ব্যবস্থা তাই উপযুক্ত দাম নির্ধারণে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্ত হতে পারে না। বিকল্প হিসেবে, দাম ধার্যের জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব আছে। অর্থনৈতিক দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি এসব তত্ত্ব সংস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারে বাধাবিপত্তি দূর করে। এসব তত্ত্ব পৃথক দাম বা ডিফারেনশিয়েটেড প্রাইসের উৎস। কেউ কেউ একে বলে থাকেন র‍্যামসে প্রাইস। এই তত্ত্বে গ্রাহক পরিষেবা মূল্যের ভিত্তিতে রেলের যাবতীয় স্থায়ী ও সাধারণ ব্যয় ভাগ করে দেওয়া হয়—অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় তাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা পরিবর্তন অনুযায়ী। প্রত্যেক পরিষেবার দাম ঠিক করা হয় তার প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে কিছুটা বেশি করে। এটা সেই পরিষেবার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। পৃথক দাম বা ডিফারেনশিয়াল প্রাইসিং নিখুঁত হলে ব্যয় ও চাহিদা, এই দুই গুণক বা ফ্যাক্টর সর্বোত্তমভাবে মেলানো যায়। কোনও পরিষেবার চাহিদা খুব বেশি অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় হলে দাম ঠিক করতে হয় প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে আরও বেশ কিছুটা জুড়ে। পুরোপুরি স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে দাম সামান্য বেশি রাখতে হবে। এসব তত্ত্বের দরুন সাধারণত দাম কমের দিকে থাকে। রেল পরিবহণ পরিষেবার চাহিদা বাড়ে। কিছু ব্যয় কোনও বিশেষ পরিষেবা বা প্রডাক্টের দামের সঙ্গে জুতে দেওয়া সম্ভব নয়। চাহিদা বাড়ার দরুন রেলের গ্রাহক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলে এই ব্যয় সবার কাছ থেকে অল্প করে তুলে নেওয়া যায়।

ঐতিহাসিকভাবে, এসব তত্ত্ব 'ভ্যালু অব সারভিস প্রাইসিং'-এর তাত্ত্বিক ভিত্তির কাজ করেছে। ভারতীয় রেল ও অন্যান্য আরও কিছু রেলে দামের এই ব্যবস্থা চালু। কিন্তু মনে রাখা দরকার তেমন কোনও শক্ত প্রতিযোগী না থাকলে এই ব্যবস্থা সম্ভব। তবে সড়ক পরিবহণ দ্রুত বিস্তারের ফলে বৈষম্যকারী দাম (বিষম দাম তত্ত্বভিত্তিক বলে) ধার্যের সুযোগ কমে গেছে অনেকখানি। এই দাম আগে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত জোগাত। এখানে আসল বক্তব্য, রেলে দাম (বিশেষত বেশি দামি পরিষেবা) একটা পর্যায়ের পর আর বাড়ানো যায় না। সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংস্থার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তত্ত্বগতভাবে যুক্তিসংগত হলেও এ ধরনের দাম ধার্য করা ভারতীয় রেলে অধুনা সম্ভব নয়। হাতেনাতে এর প্রমাণ মিলছে। দামি ও কম দামি দু' ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা রেল ছেড়ে ক্রমশ ঝুঁকছে সড়ক পরিবহণে। উচ্চ স্তরের কমিটির সুপারিশ মাফিক গত তিন দশকে পণ্য মাশুল বেড়েছে চড়া হারে। এর পাশাপাশি, বাজেটে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে ব্যয়ের তুলনায় যাত্রীভাড়া ঢের কম। ফলে ২০১২-১৩-এ যাত্রী কিলোমিটার পিছু লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ পয়সা। ২০০০-০১-এ লোকসান ছিল ১০ পয়সা। একধাপে না হলেও ক্রমশ এই ত্রুটি শুধরে নেওয়া দরকার। মনে রাখা চাই, বিভিন্ন পরিষেবার ব্যয়ের সঠিক হিসেব থাকলে তবে এটা করা সম্ভব। আবার এর মানে, মাঝে মাঝে দক্ষতার মান বা আদর্শকে (এফিসিয়েন্সি নর্ম) ভালো করে খতিয়ে দেখে এই হিসেব পাওয়া যায়। একমাত্র তাহলেই এক যুক্তিসংগত মাশুল নীতি কাঠামো খাড়া করা সম্ভব। সামাজিক কারণে কোনও ভরতুকি দিতে হলে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এতে 'সোনালি সংকট'—বাণিজ্যিক ও সামাজিক উপযোগিতার মধ্যে বাছাই করবার বিষয়টি কোনও ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে না। অর্থনীতিবিদরা একমত যে ইক্যুয়িটি ডিসট্রিবিউশান-এর দোহাই পেড়ে সামাজিক দায় বয়ে বেড়ানো অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সির কষ্টিপাথরের বিচারে ধোপে টেকে না। ক্রস সাবসিডি বা ভরতুকির ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন যুক্তি উঠে আসতে পারে। সড়কের মতো অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় রেল ঢের পরিবেশ-বান্ধব। রেল পরিষেবার দাম কমিয়ে রেখে সে বাবদ লোকসান মেটাতে পরিবেশের ক্ষতিকারী পরিবহণের দাম বাড়ানো যায়। লোকসান রেলকে বইতে হবে না (ক্রস সাবসিডি হিসেবে) বা সাধারণ করদাতাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্রস সাবসিডির দিনকাল আশু খতম হওয়া দরকার।

বাজেট প্রস্তাব

গাদাগুচ্ছের প্রকল্প অসমাপ্ত। বহু প্রকল্পের কাজে এখনও হাতই পড়েনি। তাই 'প্রায়-যোজনা-ছুটি'-এর প্রস্তাবটি অবশ্যই তারিফযোগ্য। ২০০৯-এ রেল প্রকল্প সংক্রান্ত এক শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আশা ছিল নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা শুরু হবে। না, তা হয়নি। এসব প্রকল্প ফের পুরোদস্তুর খতিয়ে দেখা এখনও সম্ভব। তথাকথিত প্রয়োজনীয়তার দিকটি তত্ত্বতালাশ করা দরকার। বহু প্রকল্প শুরুই হয়নি। এসব প্রকল্প বাতিলও করা যেতে পারে। অগ্রাধিকার দিতে হবে স্ট্র্যাটেজিক লাইন, পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও দূরপাল্লায় বহু পরিমাণ মাল পরিবহণের রেলপথ গড়ে তোলার উপর। হাই ডেনসিটি করিডরে ট্রেনের গতি বাড়ানোর ব্যাপারটি বোঝা কঠিন নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজকর্মের জন্য কিছু অর্থবরাদ্দের প্রস্তাব কাণ্ডজ্ঞানহীন। বেশ কিছু দিন যাবৎ ব্যাপারটি নিয়ে কানাঘুসো চলছে। এ প্রকল্পে অর্থ জোগাতে কয়েকটি দেশের আগ্রহ চাউর হতে উৎসাহ আরও তুঙ্গে। প্রচণ্ড ব্যয়বহুল এ প্রকল্প নিয়ে আর মাতামাতি না করা বোধহয় ভালো। এ প্রকল্পে তহবিল জোগাতে রেল অপারগ। এক্ষেত্রে বিকল্প হতে পারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। যেমনটি হয়েছে মহাসড়ক বা হাইওয়ের ক্ষেত্রে। তবে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা যে খুব মধুর তা বলা যাচ্ছে কই। জাতীয় মহাসড়কের সোনালি চতুর্ভুজে বেসরকারি ক্ষেত্রের আওতাধীন অনেক সেকশানে কাজকর্ম তেমন একটা এগোয়নি। বাধ্য হয়ে বাড়তি সেস ও লেভি বসিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে তহবিল জোগাতে হচ্ছে। এর একটা কারণ গাড়ি চলাচল যতটা হবে হিসেব করা হয়েছিল, তা হয়নি। অর্থাৎ হিসেবটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। বুলেট ট্রেনে সম্ভাব্য যাত্রী সংখ্যার হিসেবেও তা ঘটতে পারে। ব্যয়বহুল এ ব্যবস্থার আর্থিক সম্ভাবনা নিয়ে খটকা কাটছে কোথায়। এসব প্রকল্পের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকলে বেসরকারি ক্ষেত্র তা করার কোনও উপায় খুঁজেপেতে নেবে। এছাড়া শুধুমাত্র মালগাড়ি চলার জন্য পৃথক রেলপথ (ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর) তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জমি সমস্যার দরুন রেলের পক্ষে তার ব্যবস্থা খুব কঠিন। এমনকী জমি থেকে উপরে (এলিভেটেড) নতুন লাইন পাতার সিদ্ধান্ত নিলেও সমস্যা কাটবে না। ভারতের দরকার রেল ব্যবস্থা বিশেষত দূরপাল্লার রেলপথের উন্নতি। বিশাল দেশে বিভিন্ন পণ্য বিপুল পরিমাণে এক এলাকা থেকে ভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতে হলে দূরপাল্লার রেল বড় ভরসা। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এর নেটওয়ার্ক আরও বাড়ানোর দরকার। শহরগুলিতে যাত্রী ট্র্যানজিট সার্ভিস-এর প্রসারও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। বুলেট ট্রেন নয়, এসব ব্যবস্থা করতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। বুলেট ট্রেন এক কল্পনাবিলাস। একে ঘিরে লাগামছাড়া উচ্ছ্বাস বিচিত্র নয়। মুশকিল আসান না হয়ে এই রোম্যান্স কিন্তু এক সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আগেকার জনমোহিনী সিদ্ধান্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু নতুন ট্রেনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে, বিশেষজ্ঞরা বারবার জোর দিয়েছেন সত্যিকারের প্রয়োজন বিস্তারিত খতিয়ে দেখে অগ্রাধিকার ঠিক করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাত্রী ও মাল পরিবহণ চলে একই লাইনে। নতুন নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করলে চাপ সামাল দিতে রেল কর্তৃপক্ষ জেরবার হবে। অল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ সেরা উপায়।

শহরতলি পরিষেবায় উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিবহণের মধ্যে সমন্বয় বা সিমলেস ইনটারমোডাল অ্যাকসেসকে যাত্রীরা স্বাগত

জানাবে। একথা বেশি খাটে বিশেষ করে মেট্রো শহরগুলিতে। বিভিন্ন পরিবহণের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য ট্র্যানজিট কর্তৃপক্ষ গঠনের নীতি নেওয়া সত্ত্বেও প্রায় কোনও অগ্রগতি হয়নি। আন্তঃপরিবহণ সমন্বয়ের জন্য রেলকে স্থানীয় পরিষেবা সংস্থাগুলির আস্থা বা বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। ভারতীয় রেল কয়েকটি জায়গায় শহরতলির ট্রেন চালাচ্ছে। সেখানে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা কাজে লাগতে পারে। বেঙ্গালুরুর মতো জায়গায় শহরতলির ট্রেন চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ভারতীয় রেলের সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক দিন আগেই তো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এ ধরনের পরিষেবার দায়িত্ব যাবে শহরোন্নয়ন মন্ত্রকের হাতে। উল্লেখ করা দরকার, শহরাঞ্চলে ট্রেন চলাচলের বিষয়টি এক স্থানীয় চাহিদা। স্থানীয় পর্যায়ে এ চাহিদা মেটাতে হবে। ভারতীয় রেলের মতো বৃহৎ এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কেন এ দায়িত্ব নেবে।

একটি প্রকল্প সমন্বয় গোষ্ঠী গড়ার প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে। এর খুব দরকার ছিল। কারণ রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে প্রকল্প স্তরে তেমন কোনও সমন্বয় না থাকায় দেরি হয়। বাড়ে খরচ। তবে এই গোষ্ঠী গঠনই যথেষ্ট নয়। আগের বিভিন্ন কমিটি ও খুব সম্প্রতি জাতীয় পরিবহণ উন্নয়ন নীতি কমিটি একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কর্তৃপক্ষ গড়ার প্রয়োজন উল্লেখ করেছে। এ ধরনের কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে ভারতীয় রেল। লজিস্টিক হারে বিনিয়োগের প্রস্তাবটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ট্রাক শিল্পের সঙ্গে রেলের সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পরিবহণের মিলেমিশে (মালটি-মোডালিজম) কাজ করার তত্ত্বটি জোরদার হবে।

সংস্কারের প্রেক্ষাপটে, রূপায়ণ থেকে নীতি প্রণয়নকে পৃথক করার এক প্রস্তাব আছে। এ কোনও নতুন ধ্যানধারণা নয়। বহু দশক ধরে একথা উঠছে। বেশ কিছু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একটি সুপরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজি ছকে এ কাজ শুরু করা যায়। রেলের বিভিন্ন ব্যবসায়ে রূপায়ণের স্তরে কাজকর্ম স্বতন্ত্র করার বিষয়টি এর ফলে অগ্রগতি লাভ করবে। এটা রেলে কর্পোরেট ধ্যানধারণা বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে অবশ্যই। তবে এটা রেলকে বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা ভাবা কোনওভাবে ঠিক নয়। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। উৎপাদন দক্ষতার ভূমিকায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইদানীং বেশ কিছু দিন যাবৎ অনেকের মতে বেসরকারিকরণ একটা হিল্লে। কল্যাণের দিক থেকে দেখলে ও সামাজিক যে দায়িত্ব বহন করতে হবে তা বিচার করলে, বেসরকারিকরণ মারফত উৎপাদন দক্ষতায় রেলের লাভের সম্ভাবনা বেশি। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলের ঐতিহাসিক ভূমিকার দরুন বাণিজ্যিক দিক থেকে পরিষেবা বা প্রডাক্টে সংস্থার অনীহায় দেশের কিছু উপকার হয়েছে। বেসরকারিকরণ হলে সেদিক থেকে কিছুটা ক্ষতি হবে অবশ্যই। তবে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ার দরুন প্রকারান্তরে লাভের দিকে পাল্লা অনেক ঝুঁকে থাকবে। কিন্তু রেল পরিচালকদের জনস্বার্থের অছি বলে ধরার (সামাজিক কল্যাণ করার জন্য তারা সবসময় সচেষ্ট) রেওয়াজ জলাঞ্জলি দেওয়া দরকার। রেলকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন হিসেবে দেখাটা আরও ভালো হবে। সম্পত্তির অধিকার তত্ত্ব অনুসারে নতুন ভূমিকায় রেল পরিচালকরা তাদের মালিক অর্থাৎ শেয়ারগ্রহীতাদের স্বার্থে কাজ করবে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বেসরকারি ক্ষেত্র রেলে শেয়ার কেনার অনুমতি পাবে। এর ফলে রেল পরিচালন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হবে। পরিবর্তন আসবে প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও। উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর একই সঙ্গে তা সংস্থাকে বাজারের আর্থিক শৃঙ্খলার মুখে দাঁড় করাবে।

সবশেষে বলা যায়, বাজেটে দূরদর্শিতা বা ভিশান-এর ছোঁয়া আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করার জন্য স্পষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই। এটার আশু প্রয়োজন। আগামী বাজেটে যেন এ ব্যাপারে বিশদ খোঁজখবর মেলে। তবে মনে রাখা জরুরি, সংস্থাটিকে জোরদার করে তোলাই যে কোনও পরিকল্পনার বিকাশ ও রূপায়ণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।❑

[ড: এস শ্রীরামণ মুম্বই-এ অর্থনীতির অধ্যাপক]

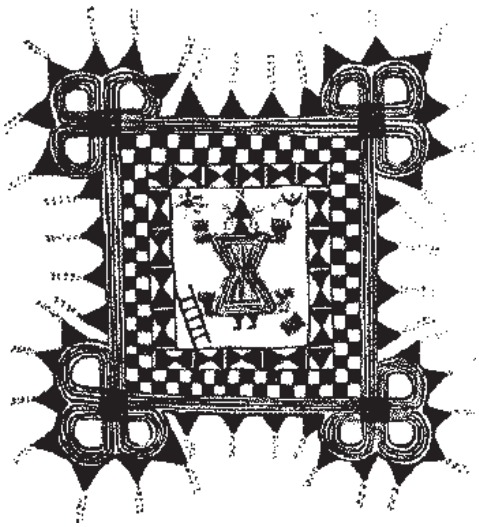

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫—একটি সমীক্ষা

লোকসভা ভোটে বিপুল জয়লাভের পর এনডিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅরুণ জেটলি তাঁর প্রথম বাজেট পেশ করলেন। নতুন সরকারের নতুন বাজেটে নতুনত্ব কিছু আছে কি? নাকি এই বাজেট পূর্বতন সরকারের বাজেটের মতোই? মোদী সরকারের এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য কী? এই সমস্ত বিষয় নিয়েই বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করছেন **জয়দেব সরখেল।**

ভূমিকা

বাজেটের আলোচনা শুরু করার আগে কী অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাজেট পেশ করা হচ্ছে সেটি সংক্ষেপে দেখা যাক। ভারতের অর্থনীতিতে গত পাঁচ বছরে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল নিম্নমুখী। ২০১০-১১ সালে এই হার ছিল ৮.৯১ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে ৬.৬৯ শতাংশ, ২০১২-১৩-এ ৪.৪৭ শতাংশ এবং ২০১৩-১৪ সালে ছিল ৪.৭৪ শতাংশ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২০১০-১১ সালে ছিল ৯.৫৪ শতাংশ। এটি ২০১১-১২-তে হয় ৫.৩৪ শতাংশ; এবং ২০১২-১৩-তে হয় ০.৯১ শতাংশ। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে গত বছর (২০১৩-১৪) বেড়ে ছিল ৪.৯৩ শতাংশ। এবছর এল্ নিনোর প্রভাবে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ২০১০-১১ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং ও খনি শিল্পে উৎপাদন ৬.৫৪ শতাংশ হারে বেড়েছিল কিন্তু তারপর গত তিন বছর এই শিল্পে কোনও বৃদ্ধিই প্রায় হয়নি। ২০১১-১২ সালে এই শিল্পে উৎপাদন বাড়ে ০.১০ শতাংশ, ২০১২-১৩-তে বৃদ্ধির হার ছিল (–) ২.১৬ শতাংশ, ২০১৩-১৪-তে ছিল (–) ১.৩৮ শতাংশ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যেখানে মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠছে সেখানে ভারতের অর্থনীতিতে পুনরুন্নতি শুরু হয়নি। এই সময়ে ভারতের অর্থনীতির প্রধান সমস্যাগুলি হল : জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পহার, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার, বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে ঘাটতি, উচ্চহারে রাজকোষ ঘাটতি, দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রাধান্য, দারিদ্র ও বেকারির সমস্যা প্রভৃতি। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়। এই বাজেটের মাধ্যমে তার চেষ্টাও করা হয়নি। তবে যেটা করা হয়েছে সেটা হল একটা বিকল্প দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করার ঘোষণা যার মাধ্যমে পরবর্তী তিন-চার বছরের মধ্যে দেশ (৭-৮) শতাংশ বিকাশের হার অর্জন করতে পারে। সেই সঙ্গে দারিদ্ররেখার নীচে জনসংখ্যা কমিয়ে আনা এবং বিকাশের ফল সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে যে এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে আসবে, রাজকোষ ঘাটতি কমে আসবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতিখাতের ঘাটতিও কমে আসবে।

একনজরে বাজেট

এখন দেখা যাক একনজরে বাজেট, যা সারণি-১-এ দেওয়া হয়েছে। এই সারণিতে রয়েছে ২০১২-১৩-এর বাস্তবিক হিসাব, ২০১৩-১৪-এর মূল বাজেটের হিসাব ও সংশোধিত বাজেটের হিসাব এবং ২০১৪-১৫ সালের বাজেটের প্রত্যাশিত হিসাব। সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৩-১৪-এর বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছিল ১০,৫৬,৩৩১ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৪-১৫-এর বাজেটে প্রত্যাশিত রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১১,৮৯,৭৬৩ কোটি টাকা। রাজস্ব প্রাপ্তির বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.৬৩ শতাংশ। রাজস্ব প্রাপ্তির দুটি অংশ—নিট কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্ব। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫-এর বাজেটের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় নিট কর রাজস্ব বাড়বে ১০.৫৩ শতাংশ এবং অ-কর রাজস্ব বাড়বে ২৩.৩৭ শতাংশ বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কর রাজস্ব অপেক্ষা অ-কর রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব প্রাপ্তি ছাড়া অপর এক প্রকার প্রাপ্তি হল মূলধনি প্রাপ্তি। ২০১৩-১৪-এর বাজেটে এই প্রাপ্তি ধরা হয়েছিল ৬,০৮,৯৬৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৪-১৫-এর বাজেটে এটি ধরা হয়েছে ৬,০৫,১২৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সামান্য কম ধরা হয়েছে। মূলধনি প্রাপ্তির তিনটি অংশ : ঋণ পরিশোধ বাবদ, অন্যান্য প্রাপ্তি এবং ঋণ ও অন্যান্য দায়। এই তিনটি অংশের প্রাপ্তি ২০১৩-১৪ বাজেট থেকে ২০১৪-১৫-এর বাজেটে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। রাজস্ব প্রাপ্তি ও মূলধনি প্রাপ্তি যোগ করে পাই মোট প্রাপ্তি। ২০১৩-১৪ বাজেটের তুলনায় ২০১৪-১৫ বাজেটে মোট প্রাপ্তি বাড়বে ১৬,৬৫,২৯৭ কোটি টাকা থেকে ১৭,৯৪,৮৯২ কোটি বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মোট প্রাপ্তি বাড়বে ৭.৭৮ শতাংশ মাত্র। যদি মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ হয় তাহলে বাজেটের মোট প্রাপ্তি প্রকৃত অর্থে কিছুই বাড়েনি।

প্রাপ্তির পর এবার ব্যয়ের দিকটি দেখা যাক। সরকারের ব্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয় এবং পরিকল্পনাখাতে ব্যয়। প্রতিটি ব্যয়ের মধ্যে আবার রাজস্বখাতে ব্যয় এবং মূলধনিখাতে ব্যয় আছে। পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয় বাড়ছে ১১,০৯,৯৭৫ কোটি টাকা থেকে ১২,১৯,৮৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০.৯৯ শতাংশ। অন্য দিকে পরিকল্পনাখাতে ব্যয় বাড়ছে ৫,৫৫,৩২২ কোটি টাকা থেকে ৫,৭৫,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৩.৫৪ শতাংশ। পরিকল্পনাখাতে ব্যয় সামান্য বাড়ছে, পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয় কিছুটা বাড়ছে। মুদ্রাস্ফীতির কথা বিচার করলে পরিকল্পনা-খাতে ব্যয় কমেছে এবং পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয় খুব সামান্য বেড়েছে প্রকৃত অর্থে।

আবার মোট ব্যয়কে যদি আমরা মোট রাজস্ব ব্যয় এবং মোট মূলধনি ব্যয় এই দুভাগে ভাগ করি এবং তুলনা করি তাহলে দেখা যায় যে মোট রাজস্ব ব্যয় বেড়েছে ১৪,৩৬,১৬৯ কোটি টাকা থেকে ১৫,৬৮,১১১ কোটি টাকা অর্থাৎ বেড়েছে ৯.১৯ শতাংশ। অন্যদিকে মোট মূলধনি ব্যয় সামান্য কমেছে—২,২৯,১২৯ কোটি টাকা থেকে ২,২৬,৭৮১ কোটি টাকা। সুতরাং বাজেটে রাজস্বখাতে আয়ই বাড়ছে মূলধনি-খাতের নয়। রাজস্ব ঘাটতি এবং রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ মোটামুটি একই আছে। জিডিপি-এর শতাংশ হিসাবে রাজস্ব ঘাটতি ৩.৩ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ২.৯ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে রাজকোষ ঘাটতি ৪.৮ শতাংশ থেকে কমে ৪.১ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোট প্রাপ্তি বা মোট ব্যয়ের দিক থেকে ২০১৪-১৫-এর বাজেট ২০১৩-১৪-এর বাজেট থেকে খুব বেশি পৃথক নয়। আর্থিক অঙ্কে বাজেটের মোট প্রাপ্তি বা মোট ব্যয় কিছুটা বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে বাস্তব অঙ্কে মোট প্রাপ্তি বা মোট ব্যয় খুব বেশি বাড়েনি। তবে এ বছরের বাজেটে কর রাজস্বের তুলনায় অ-কর রাজস্ব বেশি হারে বাড়বে বলে ধরা হয়েছে।

অর্থ সংগ্রহের উৎস

সরকার যে রাজস্ব আদায় করেন তা বিভিন্ন উৎস থেকে আদায় করা হয় যেমন কর রাজস্ব, অ-কর রাজস্ব, ঋণ নয় এমন আদায়, ঋণ প্রভৃতি। কর রাজস্বের মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। ব্যক্তিগত আয়কর, কর্পোরেশন কর প্রভৃতি হল প্রত্যক্ষ কর। অন্যদিকে আমদানি শুল্ক, অন্তঃশুল্ক, পরিষেবা কর প্রভৃতি হল পরোক্ষ কর। এই সমস্ত উৎস থেকে মোট রাজস্বের কত শতাংশ বর্তমান বাজেটে আসবে এবং গত বাজেটে কত শতাংশ এই সমস্ত উৎস থেকে এসেছে সেটি এখন দেখা যাক। এ সংক্রান্ত তথ্য সারণি-২-তে দেওয়া হয়েছে। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ ও

সারণি-১
এক নজরে বাজেট (২০১৪-১৫)

(কোটি টাকায়)

		২০১২-১৩ (বাস্তবিক)	২০১৩-১৪ (বাজেট)	২০১৩-১৪ (সংশোধিত)	২০১৪-১৫ (বাজেট)
১.	**রাজস্ব প্রাপ্তি (২ + ৩)**	**৮,৭৯,২৩২**	**১০,৫৬,৩৩১**	**১০,২৯,২৫২**	**১১,৮৯,৭৬৩**
২.	নিট কর রাজস্ব	৭,৪১,৮৭৭	৮,৮৪,০৭৮	৮,৩৬,০২৬	৯,৭৭,২৫৮
৩.	অ-কর রাজস্ব	১,৩৭,৩৫৫	১,৭২,২৫২	১,৯৩,২২৬	২,১২,৫০৫
৪.	**মূলধনি প্রাপ্তি (৫ + ৬ + ৭)**	**৫,৩১,১৪০**	**৬,০৮,৯৬৭**	**৫,৬১,১৮২**	**৬,০৫,১২৯**
৫.	ঋণ পরিশোধ বাবদ	১৫,০৬০	১০,৬৫৪	১০,৮০২	১০,৫২৭
৬.	অন্যান্য প্রাপ্তি	২৫,৮৯০	৫৫,৮১৪	২৫,৮৪১	৬৩,৪২৫
৭.	ঋণ ও অন্যান্য দায়	৪,৯০,১৯০	৫,৪২,৪৯৯	৫,২৪,৫৩৯	৫,৩১,১৭৭
৮.	**মোট প্রাপ্তি (১ + ৪)**	**১৪,১০,৩৭২**	**১৬,৬৫,২৯৭**	**১৫,৯০,৪৩৪**	**১৭,৯৪,৮৯২**
৯.	**পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় (১০ + ১২)**	**৯,৯৬,৭৪৭**	**১১,০৯,৯৭৫**	**১১,১৪,৯০২**	**১২,১৯,৮৯২**
১০.	রাজস্ব ব্যয় যার মধ্যে	৯,১৪,৩০৬	৯,৯২,৯০৮	১০,২৭,৬৮৯	১১,১৪,৬০৯
১১.	সুদ প্রদান	৩,১৩,১৭০	৩,৭০,৬৮৪	৩,৮০,০৬৬	৪,২৭,০১১
১২.	মূলধনি ব্যয়	৮২,৪৪১	১,১৭,০৬৭	৮৭,২১৪	১,০৫,২৮৩
১৩.	**পরিকল্পনাখাতে ব্যয় (১৪ + ১৫)**	**৪,১৩,৬২৫**	**৫,৫৫,৩২২**	**৪,৭৫,৫৩২**	**৫,৭৫,০০০**
১৪.	রাজস্বখাতে	৩,২৯,২০৮	৪,৪৩,২৬০	৩,৭১,৮৫১	৪,৫৩,৫০৩
১৫.	মূলধনিখাতে	৮৪,৪১৭	১,১২,০৬২	১,০৩,৬৮১	১,২১,৪৯৭
১৬.	**মোট ব্যয় (৯ + ১৩)**	**১৪,১০,৩৭২**	**১৬,৬৫,২৯৭**	**১৫,৯০,৪৩৪**	**১৭,৯৪,৮৯২**
১৭.	রাজস্ব ব্যয় (১০ + ১৪)	১২,৪৩,৫১৪	১৪,৩৬,১৬৯	১৩,৯৯,৫৪০	১৫,৬৮,১১১
১৮.	যার মধ্যে মূলধনি সম্পদ সৃষ্টিতে গ্রান্ট	১,১৫,৭১০	১,৭৪,৬৩৩	১,৩৮,২২৮	১,৬৮,১০৪
১৯.	মূলধনি ব্যয় (১২ + ১৫)	১,৬৬,৮৫৮	২,২৯,১২৯	১,৯০,৮৯৪	২,২৬,৭৮১
২০.	**রাজস্ব ঘাটতি (১৭ – ১)**	**৩,৬৪,২৮২** (৩.৬)	**৩,৭৯,৮৩৮** (৩.৩)	**৩,৭০,২৮৮** (৩.৩)	**৩,৭৮,৩৪৮** (২.৯)
২১.	**কার্যকরী রাজস্ব ঘাটতি (২০ – ১৮)**	**২,৪৮,৫৭২** (২.৫)	**২,০৫,২০৫** (১.৮)	**২,৩২,০৬০** (২.০)	**২,১০,২৪৪** (১.৬)
২২.	**রাজকোষ ঘাটতি {১৬ – (১ + ৫ + ৬)}**	**৪,৯০,১৯০** (৪.৮)	**৫,৪২,৪৯৯** (৪.৮)	**৫,২৪,৫৩৯** (৪.৬)	**৫,৩১,১৭৭** (৪.১)
২৩.	**প্রাথমিক ঘাটতি (২২ – ১১)**	**১,৭৭,০২০** (১.৮)	**১,৭১,৮১৪** (১.৫)	**১,৪৪,৪৭৩** (১.৩)	**১,০৪,৬৬** (০.৮)

সূত্র : বাজেট ২০১৪-১৫ (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি GDP-এর শতাংশ)

অন্যান্য দায় থেকে মোট রাজস্বের ২৭ শতাংশ এসেছিল গত বছরে। এ বছরে ওই উৎস থেকে মোট রাজস্বের ২৪ শতাংশ আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। কোম্পানির আয়কর থেকে মোট রাজস্বের ২১ শতাংশ এসেছিল গত বছর। এ বছরেও এটি ২১ শতাংশ ধরা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়কর থেকে মোট রাজস্বের ১৩ শতাংশ আসবে বলে ধরা হয়েছে। গত বছর এটি ছিল ১২ শতাংশ। আমদানি শুল্ক (৯ শতাংশ) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক (১০ শতাংশ) থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের শতাংশ একই থাকবে বলে ধরা হয়েছে। তেমনি ঋণবহির্ভূত মূলধনি আদায়ের শতাংশ (৩ শতাংশ) ও একই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিষেবা কর ও অন্যান্য কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং অ-কর রাজস্ব এই দুটি উৎসের শতাংশ গত বছরের ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ হবে বলে

ধরা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলির ধরনে কোনও বিরাট পরিবর্তন নেই। এই দিক থেকে দেখতে গেলেও বর্তমান বছরের বাজেট অনেকাংশে গত বছরের বাজেটের অনুরূপ।

বিভিন্নখাতে ব্যয়বরাদ্দ

এবার সরকারের রাজস্ব যে বিভিন্নখাতে ব্যয় করা হয় সেটির ধরন এখন দেখা যাক। এই খাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাখাতে ব্যয়, রাজ্য পরিকল্পনাবাবদ সাহায্য, পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যয়, সুদ প্রদান, প্রতিরক্ষা, ভরতুকি প্রভৃতি। মোট ব্যয়ের কত শতাংশ এই খাতগুলিতে ব্যয় করা হবে এবং কত শতাংশ গত বছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল তা এখন দেখা যাক। এ সংক্রান্ত তথ্য সারণি-৩-এ দেওয়া হয়েছে। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাখাতে ব্যয়বরাদ্দ গত বছরের ২১ শতাংশ থেকে কমিয়ে এ বছর ১১ শতাংশ করা হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দ অর্থ সাহায্য ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। নতুন সরকার রাজ্য পরিকল্পনার উপর জোর দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উপর জোর কমাচ্ছেন। এইভাবে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে। অন্য খাতগুলিতে ব্যয়বরাদ্দ মোটামুটি গত বছরের মতোই রাখা হয়েছে। পরিকল্পনাবহির্ভূত অন্যান্য ব্যয় (১১ শতাংশ), প্রতিরক্ষা (১০ শতাংশ), ভরতুকি (১২ শতাংশ) গতবারের স্তরেই আছে। পরিকল্পনাবহির্ভূতখাতে রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য গত বছরের ৪ শতাংশ থেকে কমে ৩ শতাংশ ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কে রাজ্যের অংশ ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। সুদ প্রদানখাতে ব্যয়ের শতাংশ ১৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকেও দেখা যাচ্ছে যে পরিকল্পনা-খাতে বরাদ্দ বাদ দিলে অন্যান্যখাতে ব্যয় বরাদ্দের ধরন গত বছরের ন্যায়ই আছে। বিশাল কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না। এদিক থেকেও বলা যেতে পারে বর্তমান বছরের বাজেট গত বছরের বাজেটের মতোই। কিন্তু তার মানে কি এই যে, এ বছরের বাজেট গত বছরের মতোই গতানুগতিক? এ বছরের বাজেটের কোনও নতুনত্ব নেই? উত্তরে বলা যেতে পারে এ বছরের বাজেটে কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে যা গতানুগতিকতা মুক্ত। এই কর্মসূচিগুলি আমরা এখন আলোচনা করব।

সারণি-২
বাজেটের অর্থসংগ্রহের উৎস
(শতাংশ হিসাবে)

উৎস	শতকরা অংশ
১. ঋণ ও অন্যান্য দায়	২৪(২৭)
২. কোম্পানির আয়কর	২১(২১)
৩. ব্যক্তিগত আয়কর	১৩(১২)
৪. আমদানি শুল্ক	৯(৯)
৫. কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক	১০(১০)
৬. পরিষেবা কর ও অন্যান্য কর	১০(৯)
৭. অ-কর রাজস্ব	১০(৯)
৮. ঋণবহির্ভূত মূলধনি আদায়	৩(৩)
মোট	১০০(১০০)

সূত্র : বাজেট ২০১৪-১৫ (বন্ধনীর মধ্যে অবস্থিত সংখ্যাগুলি ২০১৩-১৪ বাজেটের হিসাব)

সারণি-৩
বিভিন্ন খাতে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ
(শতাংশ হিসাবে)

উৎস	শতকরা অংশ
১. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	১১(২১)
২. রাজ্য পরিকল্পনাখাতে সাহায্য	১৫(৭)
৩. পরিকল্পনাবহির্ভূতখাতে রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য	৩(৪)
৪. কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কে রাজ্যের অংশ	১৮(১৭)
৫. পরিকল্পনাবহির্ভূত অন্যান্য ব্যয়	১১(১১)
৬. সুদ প্রদান	২০(১৮)
৭. প্রতিরক্ষা	১০(১০)
৮. ভরতুকি	১২(১২)
মোট	১০০(১০০)

সূত্র : বাজেট ২০১৪-১৫ (বন্ধনীর মধ্যে অবস্থিত সংখ্যাগুলি ২০১৩-১৪ বাজেটের হিসাব)

বাজেটের নতুনত্ব

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়কে উৎসাহ দেওয়া। এই বাজেটে করের হারের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু ষাট বছর পর্যন্ত করদাতাদের আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় আয়কর মুক্ত রাখা হয়েছে। আগে এটি ছিল দু লক্ষ টাকা। ষাট বছরের বেশি কিন্তু আশি বছরের কম করদাতাদের ক্ষেত্রে এই সীমা আড়াই লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় জীবন বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকার বদলে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে আগে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যেত। এটি এখন বাড়িয়ে দেড় লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্তের করের বোঝা কমবে এবং তাদের সঞ্চয় বাড়বে। স্বল্প সঞ্চয়ের হাতিয়ার হিসাবে আগে কৃষাণ বিকাশ পত্র খুব জনপ্রিয়

ছিল। কিন্তু পরে এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে বাজেটে এই কিষাণ বিকাশ পত্রকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর ফলে স্বল্প সঞ্চয় উৎসাহিত হবে।

দ্বিতীয়ত, গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রও এই বাজেটের ফলে লাভবান হবে। গৃহ ঋণের সুদ দিলে আগে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যেত। আয়কর আইনের ২৪নং ধারায় এই সুদ মোট বেতন গণনার আগে বাদ দেওয়া হত। গৃহ ঋণের সুদে ছাড়ের পরিমাণ বর্তমান বছরে বাড়িয়ে করা হয়েছে সর্বাধিক দু লক্ষ টাকা। এর ফলে গৃহ ঋণ সুলভ হবে। গৃহ ঋণের চাহিদা বাড়বে এবং গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্র উপকৃত হবে। গৃহ নির্মাণে দেশি ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়বে।

তৃতীয়ত, অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে তা হল বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি। বেসরকারি বিমাক্ষেত্র পুঁজির অভাবে ধুঁকছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিমাক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে বিমা সংস্থার বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। একইভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হবে বলে বাজেটে ঘোষণা করা হবে। ভারত বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি করে। ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে। এখন যদি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিদেশি পুঁজির মাধ্যমে দেশেই উৎপন্ন হয় তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। উপরন্তু বিদেশি মুদ্রা আমদানি হবে। আবার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশে উৎপাদন করলে দেশের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়বে। এতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থমন্ত্রী নিজের পুঁজি-বান্ধব ভাবমূর্তিটাই প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থত, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এর আগের বাজেটগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষাকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষা ততটা গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বর্তমান বাজেটে উচ্চশিক্ষার সার্বিক উন্নতিতে জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঁচটি আইআইটি এবং পাঁচটি আইআইএম স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানে। উদ্যান সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে তেলেঙ্গানা এবং হরিয়ানায়। এছাড়া পুসার কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ধাঁচে অসম ও ঝাড়খণ্ডে দুটি প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য 'পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশিক্ষা অভিযান বা রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান যেমন চলছে তেমনি চালু থাকবে কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মূল লক্ষ্য হবে সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্বের প্রথম দুশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় স্থান পায়নি ভারতের কোনও প্রতিষ্ঠানই। তাই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতিতে নজর দিয়েছে সরকার।

পঞ্চমত, উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সারা দেশে ১০০টি স্মার্ট সিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০৬০ কোটি টাকা। স্মার্ট সিটি হল বর্তমান বড় শহরগুলির পাশে গড়ে তোলা উপনগরী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণ ঘটতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করার প্রবণতা বাড়ে। উন্নয়নের ফলে তৈরি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের লক্ষ্য উন্নতমানের জীবনযাত্রা। এই নতুন মধ্যবিত্তদের জন্য চাই নতুন শহর। অর্থমন্ত্রী এই সব শহরকে বলেছেন স্মার্ট সিটি। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এই ধরনের স্মার্ট সিটিতে আবাসন তৈরির জন্য বিদেশি বিনিয়োগ টানতে চায় কেন্দ্র। তাই প্রকল্পের মাপ ২০ হাজার বর্গমিটারে নামিয়ে আনা হয়েছে। আগে ৫০ হাজার বর্গমিটারের নীচে কোনও প্রকল্প প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নেওয়ার ছাড়পত্র পেত না। সেই সঙ্গে নামিয়ে আনা হয়েছে বিনিয়োগের পরিমাণ। আগে যেখানে ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ মার্কিন ডলার, এখন তা কমিয়ে করা হয়েছে ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার। আশা করা যাচ্ছে এর ফলে আবাসন শিল্প যথেষ্ট লাভবান হবে।

স্মার্ট সিটি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও একটি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। এটির নাম 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রুরবান মিশন'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের (রুরাল) মানুষকে দেওয়া হবে শহরের (আরবান) সুবিধা। তাই এই প্রকল্পের নাম রুরবান। গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে খেয়াল রাখবে এই প্রকল্প। এই জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইউপিএ সরকারের গৃহীত ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বা এমজিএনআরইজিএ-ও চালু থাকবে। তবে এই প্রকল্পে বরাদ্দ অনেকটাই হ্রাস করা হয়েছে।

উপসংহার

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য এবং শিল্পমহল ও লগ্নিকারিদের আস্থা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কীভাবে তা হবে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিশা মেলেনি। অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহসী পদক্ষেপও নিতে পারেননি। আসলে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাজেট তৈরি করা এবং অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই এটা হয়েছে বলে মনে হয়। কোয়ালিশন সরকারের বাধ্যবাধকতার জন্য মনমোহন সরকার অনেক অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করতে পারেনি। মোদী সরকারের সেই বাধা নেই কারণ এই সরকারের পিছনে রয়েছে বিপুল সংখ্যাধিক্য। এই অবস্থায় সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে মোদী সরকারের কোনও অসুবিধা হবে না। এখন দেখার এই সরকারের সদিচ্ছা কতটা। আগামী দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ব্যাংকিং সংস্কারের সঙ্গে সামাজিক ব্যাংকিংকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

নতুন সরকার, নতুন নীতি, অর্থনৈতিকভাবে দেশকে বলিষ্ঠতা দেওয়ার নতুন প্রচেষ্টা। এবারের বাজেটের অন্যান্য দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রেও এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা নবনির্বাচিত সরকারের ভবিষ্যৎ দিশা-দৃষ্টিভঙ্গিরও আভাস দেয়। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আনা সংস্কারও তারই ইঙ্গিতবাহী। লিখেছেন **তপনকুমার ভট্টাচার্য**।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখে সংসদে পেশ করলেন ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তারিখে বাজেট পেশের দিন ধার্য থাকলেও লোকসভার নির্বাচনের জন্য তা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনোত্তর পর্বে নতুন সরকার গঠিত হওয়া ইস্তক খরচ চালাতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে পূর্বতন সরকারের অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম পেশ করেছিলেন অন্তর্বর্তী বাজেট। আর এখন পেশ হল পূর্ণাঙ্গ বাজেট। তবে চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে আর সাড়ে আট মাস মতো বাকি থাকলেও আয়তনের দিক থেকে যথেষ্ট বড় বাজেটই পেশ করেছেন নতুন অর্থমন্ত্রী এবং প্রায় ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের বক্তৃতায় অর্থনীতির এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বাজেটে ২০১৪-১৫ সালের জন্য তিনি মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরেছেন ১৭,৯৪,৮৯২ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১২,১৯,৮৯২ কোটি টাকা এবং পরিকল্পনা খাতে ৫,৭৫,০০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় বলতে বোঝায় চলতি খাতের ব্যয়, অর্থাৎ বেতন, অনুদান ঋণের সুদ প্রভৃতি এবং এর ফলে কোনও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় না। অন্য দিকে পরিকল্পনাখাতে ব্যয়ের ফলে দেশে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়, বেশি করে গড়ে ওঠে সেচ প্রকল্প, বিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি এবং ফলে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত হয়। ২০১৩-১৪ সালে পরিকল্পনাখাতে ৪,৫৩,০৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল, এবার এই পরিমাণটা ২৬.৯ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সরকারের ব্যয় মেটাতে রাজস্বখাতে প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১১,৮৯,৭৬৩ কোটি টাকা এবং ঋণ ব্যতিরেকে মূলধনিখাতে প্রাপ্তি (পূর্বের ঋণ আদায়, বিলগ্নীকরণ প্রভৃতি) ধরা হয়েছে ৭৩,৯৫২ কোটি টাকা। সুতরাং রাজকোষ ঘাটতি ৫,৩১,১৭৭ কোটি টাকা এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে ৪.১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭-র জন্য তিনি রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন যথাক্রমে ৩.৬ শতাংশ এবং ৩ শতাংশ। চলতি বছরে রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৯ শতাংশ।

বাজেটে পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দ বাড়ায় পরিকাঠামো এবং উৎপাদন শিল্পের বিকাশ ঘটবে, দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে আর এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের ব্যাংকগুলিকে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হবে। অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলিকে এক দিকে তাদের পরিষেবার বিস্তার ঘটাতে হবে, অন্য দিকে তাদের আরও বেশি করে ঋণের সংস্থান করতে হবে। আর কেবলমাত্র শক্তপোক্ত মূলধনি ভিতের উপর দাঁড় করানো ব্যাংকগুলির পক্ষেই এই ঋণ-চাহিদা মেটানো সম্ভব। বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলির ৮০ শতাংশই সরকারি ব্যাংক এবং এক সময়ে এই সব ব্যাংকের ১০০ শতাংশ শেয়ারই ছিল সরকারের মালিকানাধীন। ১৯৯৪ সালের ব্যাংকিং আইন সংশোধন করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে বাজারে শেয়ার ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে সরকারের মালিকানা ৫১ শতাংশ রেখে এই সব ব্যাংক সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার ছাড়তে শুরু করে। এভাবে শেয়ার ছাড়ার ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে সরকারের অংশীদারিত্ব ৫৫ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। একই সঙ্গে এই সব ব্যাংকের দাদন যত বেড়েছে তাদের মূলধনের পরিমাণও বাড়াতে হয়েছে আর বাড়তি মূলধনের বেশির ভাগই সরকারকে বাজেট থেকে সংস্থান করতে হয়েছে এবং পরিমাণটাও হাজার হাজার কোটি টাকা। কেবলমাত্র ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪—এই দু'বছরেই বাজেট থেকে সহায়তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২,৫০০ কোটি এবং ১৪,০০০ কোটি টাকা। সরকারের বক্তব্য, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারের পক্ষে আর বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে সরকার কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেবার কাজে ব্যাংকগুলিকে শামিল করেছেন। অথচ মূলধনি পর্যাপ্ততা না থাকলে ব্যাংকগুলি ইচ্ছামতো ঋণ বাড়িয়েও যেতে পারে না। কারণ ব্যাসেল নর্ম অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাংকের সেটাই নির্দেশ। বাজেটে বলা হয়েছে ব্যাসেল-৩ নর্মস অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে ব্যাংকগুলিকে অতিরিক্ত ২,৪০,০০০ কোটি টাকার মূলধন সংগ্রহ করতে হবে এবং এর সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকেই সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাসেল হল সুইজারল্যান্ডের একটি শহর এবং এখানে রয়েছে 'ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট'। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বি আই এস'-এর সদস্য এবং এই সব কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি 'বি আই এস'-এর সুপারিশ মানতে তাদের দেশের ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশের মূল কথা হল ব্যাংকের সম্পদের ঝুঁকির নিরিখে 'মূলধনি পর্যাপ্ততা'। ব্যাংকের সম্পদের সিংহভাগই হল ব্যাংকের দাদন এবং এই দাদান বা ঋণ দেওয়ার মধ্যে ঝুঁকিও কম নয়। কারণ ভবিষ্যতে সেই ঋণটা ফেরত নাও আসতে পারে, অর্থাৎ ঋণটা অনাদায়ি হয়ে যেতে পারে এবং পর্যাপ্ত মূলধন থাকলে ব্যাংকগুলি সেই লোকসান

সামাল দিতে পারে। তবে এই অনাদায়ের পরিমাণ মাত্রাছাড়া হলে ব্যাংকটি লালবাতিও জ্বালতে পারে। কেবলমাত্র চিট ফান্ডে লালবাতি জ্বলার ফলে যে আমানতকারীরা সর্বস্বান্ত হন তা নয়, ব্যাংকে লালবাতি জ্বললেও আমানতকারীরা সর্বস্বান্ত হন। স্বাধীনতার আগে ব্যাংক উঠে যাওয়া এবং আমানতকারীদের পথে বসা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু স্বাধীনতার পর রিজার্ভ ব্যাংকের কঠোর তদারকির ফলে এভাবে ব্যাংকগুলিকে লাটে উঠতে দেখা যায়নি। তবে স্বাধীনতার পর অনাদায়ি ঋণের ভারে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কিছু সমবায় ব্যাংক ধসে পড়েছে এবং আমানতকারীরা আমানত হারিয়ে পথে বসেছেন। কারণ এই সব সমবায় ব্যাংকগুলির বেশির ভাগই রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কঠোর অনুশাসন সেখানে অনুপস্থিত।

ব্যাসেল-১ পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়েছে, বর্তমানে চলছে ব্যাসেল-২ পর্ব এবং একই সঙ্গে ব্যাসেল-৩-এর প্রস্তুতিপর্বও শুরু হয়েছে। প্রতিটি পর্বে 'বি আই এস' এবং সদস্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বৈঠকে ব্যাংকগুলির ন্যূনতম মূলধন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী পর্বে আগের পর্বের মূলধনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। ব্যাসেল-৩ পুরোপুরি কার্যকর করার সময় রাখা হয়েছে ৩১ মার্চ ২০১৮। ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী ব্যাংকগুলি যাতে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য বাজেটে তাদের বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে বলা হয়েছে কর্পোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী নয়, বেশির ভাগ শেয়ার সাধারণ পাবলিকের কাছে বিক্রি করেই টাকা তুলতে হবে আর এর ফলে সাধারণ মানুষ ব্যাংকের মালিকানার অংশীদার হতে পারবেন। ভবিষ্যতে সরকারি ব্যাংকগুলিকে কাজকর্মের ব্যাপারে আরও বেশি স্বাধীনতা দেবার কথা বাজেটে বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনে তাদের জবাবদিহি করার সংস্থানও রাখা হয়েছে।

কৃষি ও কৃষি ঋণ

প্রতিবারের মতো এবারও বাজেটে কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, দেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ১৬ শতাংশ আসছে কৃষি থেকে এবং দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং গত পাঁচ বছরে এই বৃদ্ধি ৩.৬ শতাংশে আটকে রয়েছে। সুতরাং কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প এবং প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে বাজেটে কৃষি-প্রযুক্তি ও কৃষি- গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি-প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়তে বাজেটে ১০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে কৃষি ঋণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাজেটে চলতি বছরের জন্য কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের চেয়ে ১ লক্ষ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৭ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং অর্থমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেছেন যে ব্যাংকগুলি এই লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যাবে। তাছাড়া শস্য ঋণের সুদের ক্ষেত্রে যে ভরতুকি প্রকল্প চালু রয়েছে সেটি ২০১৪-১৫ সালেও চালু রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই ভরতুকি প্রকল্পটি হল, ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ ৯ শতাংশ হলেও কৃষকদের দিতে হবে ৭ শতাংশ এবং বাকি ২ শতাংশ সরকার ব্যাংকগুলিকে ভরতুকি হিসেবে দিয়ে দেবে। আর যে সব ঋণগ্রহীতারা সময়মতো ঋণ পরিশোধ করবেন তাঁদের ভরতুকির পরিমাণ আরও ৩ শতাংশ বাড়ানো হবে এবং ফলে তাঁদের ক্ষেত্রে সুদ ৪ শতাংশ।

দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটি অন্যতম কারণ কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামো সেভাবে গড়ে না ওঠা। পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদাম এবং হিমঘরের অভাবে কৃষকরা অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হন। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গুদামঘর নির্মাণ প্রকল্পে বাজেটে চলতি আর্থিক বছরের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের পরিকাঠামো যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে একটি 'দীর্ঘমেয়াদি গ্রামীণ ঋণদান তহবিল' গঠন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং প্রস্তাব কার্যকর করতে প্রাথমিক মূলধন ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা নাবার্ডের পরিচালনায় থাকবে এই তহবিল এবং এই তহবিল থেকে সমবায় ব্যাংক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলিকে তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে রিফিনান্সের সংস্থান করা হবে। মনে রাখতে হবে ব্যাংকের মেয়াদি ঋণ পরিকাঠামো নির্মাণের সহায়ক। তাছাড়া চাষের মরশুমে গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি থেকে কৃষকদের যাতে শস্যঋণ পেতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য নাবার্ডের তত্ত্বাবধানে গঠিত 'স্বল্পমেয়াদি ঋণদান তহবিল'কে পুষ্ট করতে চলতি আর্থিক বছরের জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্য বারের মতো এবারও বাজেটে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে ৫,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে আর এর ফলে এই তহবিলের মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ২৫,০০০ কোটি টাকা। এই তহবিলের সম্পদ সংগ্রহের আর একটি উৎস হল, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে যে জরিমানা করা হয় সেই জরিমানার অর্থ। এই তহবিল থেকে গ্রামের বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে ব্যাংক ঋণ

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগগুলি হল দেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা। শিল্পোৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের এক বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে এই সব উদ্যোগ। কেবলমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পই নয়, পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির এক উল্লেখযোগ্য অংশও এই সব উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশিরভাগই একক মালিকানায় গঠিত হয়েছে এবং এই সব মালিকানার এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষজন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই সব সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান একান্ত জরুরি, কারণ এর ফলে দেশের দুর্বল শ্রেণির মানুষই বেশি করে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে পারবেন।

দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন এই সব ক্ষুদ্র উদ্যোগকে হাতিয়ার করে দেশে অসংখ্য উদ্যোগপতি গড়ে তোলা। ব্যাংকগুলি ঋণ দিলেও প্রকল্পর পুরো অর্থ তারা ঋণ দেয় না এবং একটা অংশ উদ্যোগপতিদের নিজেদেরই বহন করতে হয়। এই অংশকে বলা হয় ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব ইক্যুইটি বা মূলধন (ঋণের মার্জিন) আর এই টাকা জোগাড় করতে না পারায় ছোট এবং

প্রথম প্রজন্মের উদ্যোগপতিদের অনেকেই ব্যাংকের ঋণ পেতে সক্ষম হন না। বিষয়টি মাথায় রেখে এই সব উদ্যোগীদের জন্য বাজেটে ১০,০০০ কোটি টাকার 'ঝুঁকি মূলধন তহবিল' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করা হয়েছে এই তহবিল বেশি পরিমাণে বেসরকারি মূলধন টেনে আনার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করবে। এই তহবিল থেকে নামমাত্র সুদে ঋণ নিয়ে উদ্যোগীরা তাঁদের ইক্যুইটির প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। এছাড়া বাজেটে এই সব ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলতে ২০০ কোটি টাকার আরও একটি তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। নতুন উদ্যোগপতি গড়ে তোলা, তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানো এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই নতুন তহবিলকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব রয়েছে।

যে কোনও উদ্যোগের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উৎপাদনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় পর্যায়ে সংযোগগুলি (forward and backward likkage) ঠিক ভাবে গড়ে তোলা। প্রাক্‌পর্যায়ে যেমন রয়েছে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা, শ্রমিক জোগাড় করা পরবর্তী পর্যায়ে সেরকম রয়েছে বিপণনের ব্যবস্থা করা। সংস্থাটি ঠিকভাবে চালাতে হলে এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে উদ্যোগপতিদের সহায়তা দিতে বাজেটে কর্মসূচি নেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণের বিষয়ে নতুন করে পর্যালোচনারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০০৬ সালের 'এমএসএমই' আইন অনুযায়ী উৎপাদনমূলক সংস্থার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের সংজ্ঞা এই সব সংস্থায় যন্ত্রপাতিতে (প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি) মূল বিনিয়োগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় এবং এই বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত রয়েছে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ টাকা, ৫ কোটি টাকা এবং ১০ কোটি টাকা। পরিষেবামূলক সংস্থার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় সাজসরঞ্জামে (ইকুইপমেন্ট) মূল বিনিয়োগের ভিত্তিতে এবং এক্ষেত্রে এই বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা যথাক্রমে ১০ লক্ষ টাকা, ২ কোটি টাকা এবং ৫ কোটি টাকা। বাজেটে এই উভয় সীমাই বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে এবং উদ্যোগপতিদের নতুন চিন্তাভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে সারা দেশ জুড়ে জেলায় জেলায় 'ইনকিউবেশন' কেন্দ্র গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই সব ক্ষুদ্র উদ্যোগের আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং এ বিষয়ে সুপারিশ করতে বাজেটে একটি কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিতে অর্থ মন্ত্রক, ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক এবং রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা থাকবেন এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁরা প্রতিবেদন জমা দেবেন। তাছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোগের সহায়ক দেউলিয়া আইন পর্যালোচনার কথাও বলেছেন অর্থমন্ত্রী। আমাদের দেশে শিল্পের প্রয়োজনে কোনও ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়া সহজ নয়। আইন সংশোধন হলে উদ্যোগ গুটিয়ে নেওয়া সহজ হবে এবং ফলে নতুন প্রকল্প গড়ে ওঠার পথও সুগম হবে।

সকলের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও গৃহঋণের সুদের উপর করছাড়

খাদ্য বস্ত্রর পর মানুষের অতি প্রয়োজনীয় হল বাসস্থান এবং এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মাথার উপর কোনও ছাদ নেই। গ্রামীণ বাসস্থান সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে ২০১২ সালের যে অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে জানা যায় গ্রামাঞ্চলে নিজস্ব বাসস্থান নেই এরকম পরিবারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ এবং দু' কোটি পরিবারের রয়েছে অস্থায়ী বাসস্থান। আর শহরাঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ যেভাবে বস্তিতে এবং ফুটপাথে বসবাস করেন তা এই একবিংশ শতাব্দীতে মানবতার লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অর্থমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, ২০২২ সালের মধ্যে তাঁর সরকার সকলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত বছরগুলিতে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ তহবিল থেকে এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই তহবিলকে আরও বেশি কার্যকর করতে অর্থমন্ত্রী ২০১৪-১৫ সালের জন্য জাতীয় গৃহ ব্যাংককে (ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক) ৮,০০০ কোটি দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে গ্রামীণ বাসস্থান প্রকল্পটির পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বেশি সংখ্যক গ্রামবাসী তাঁদের বাসস্থানের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন।

গ্রাম শহর সর্বত্রই মানুষকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দিতে গৃহঋণের সুদের উপর করছাড়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। আয়কর আইনের ২৪ নং ধারা অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী এই ছাড়ের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে দু' লক্ষ টাকা করেছেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রী স্বল্পমূল্যের গৃহনির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নতুন প্রকল্প রচনার কথা বলেছেন। তাছাড়া শহরাঞ্চলের গরিব মানুষ যাতে ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে স্বল্পমূল্যের বাসস্থান নির্মাণ করতে পারেন সেদিকে লক্ষ রেখে ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংককে ৪,০০০ কোটি টাকা দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি শহরাঞ্চলের বস্তি উন্নয়নের বিষয়টি কর্পোরেট ক্ষেত্রের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এর ফলে বেসরকারি সংস্থার অর্থ আবাসন শিল্পে আরও বেশি করে টেনে আনা সম্ভব হবে এবং বস্তি উন্নয়নের কাজে গতি আসবে। আবাসন শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের নিয়ম কানুনও অর্থমন্ত্রী শিথিল করেছেন।

সামাজিক ব্যাংকিং

অর্থমন্ত্রী বাজেটে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পকে (ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন) শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। সরকার ও ব্যাংকের যৌথ প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ১৯৯৯ সালে চালু হয়েছিল 'স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' প্রকল্প। ব্যাংকের ঋণ এবং সরকারি অনুদানের সহায়তায় গ্রামের গরিব মানুষরা যাতে অর্থকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে গরিবি রেখার উপরে উঠে আসতে পারেন সেজন্যই চালু হয়েছিল এই প্রকল্প। প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে ২০১১ সালে চালু হয় এই লাইভলিহুড মিশন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দরিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে গরিব মানুষদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া আর এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হল স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা (পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব রয়েছে)। বর্তমানে এই প্রকল্পে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ৭ শতাংশ সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়ে আসছে, তবে যে সব স্বনির্ভর গোষ্ঠী সময়মতো ঋণ পরিশোধ করেছে তারা

দেশের ১৫০টি জেলায় ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে আরও ১০০টি জেলায় এই ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া গ্রামে নতুন উদ্যোগপতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচিও তিনি ঘোষণা করেছেন এবং এ বাবদ বরাদ্দ করেছেন ১০০ কোটি টাকা।

সামাজিক ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কাজ দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। এ ব্যাপারে নতুন সরকারের প্রথম কর্মসূচি হল আগামী ১৫ আগস্ট তারিখে 'ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন মিশন'-এর সূচনা করা। এই মিশনের লক্ষ্য দেশের সমস্ত পরিবারকে ব্যাংক পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা, প্রতিটি পরিবারের জন্য দু'টি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা এবং তাঁরা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারেন সেদিকে লক্ষ রাখা। অর্থমন্ত্রী আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষদের ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন আর এই সব মানুষদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণি।

বাজেটে ব্যাংকিং সংক্রান্ত অন্যান্য ঘোষণা

দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ব্যাংক শিল্পকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর উল্লেখ রয়েছে বাজেটে। কিন্তু দেশের ব্যাংকগুলি নিজেরাই কতটা শক্তিশালী? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ব্যাংকগুলির হাল সুবিধের নয়, তারা অনাদায়ি ঋণের ভারে জেরবার এবং ফলে তাদের অনেকেরই লাভের পরিমাণ কমছে। ২০১৩-র মার্চ মাসের শেষে দেশের ব্যাংকগুলির অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তাদের মোট ঋণের ৩.৬ শতাংশ যা এক বছর আগেও ছিল ৩.১ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছ'টি নতুন ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ব্যাংকের অনদায়ি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে গঠিত হয় এই সব ট্রাইবুনাল এবং ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলেই ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হওয়া যায়।

একেই তো অনাদায়ি ঋণের বোঝা, তার উপর আকারে ছোট হওয়ায় দেশের ব্যাংকগুলি সেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে না বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকের ধারণা। আমাদের ব্যাংকগুলি পৃথিবীর বড় বড় ব্যাংকগুলির তুলনায় চুনোপুঁটি মাত্র এবং ব্যাংক শক্তিশালী না হলে তার পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সেভাবে অংশগ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং এতগুলি সরকারি ব্যাংক না রেখে কয়েকটিকে পারস্পরিক মিলিয়ে দিয়ে বৃহৎ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দীর্ঘ দিনের। সরকার নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব মেনেও নিয়েছেন। এখন দেখার প্রস্তাব কীভাবে কার্যকর হয়।

বাজেটে সঞ্চয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, ২০১২-১৩ সালে আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩০.১ শতাংশ, অথচ ২০০৯-১০ সালে পরিমাণটা ছিল ৩৩.৭ শতাংশ। মানুষকে বেশি করে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় জমার পরিমাণ তিনি ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১.৫০ লক্ষ টাকা করেছেন। ৫ বছর এবং তার বেশি সময়ের জন্য ব্যাংকের স্থায়ী আমানত এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। তবে এক্ষেত্রে জমার পরিমাণ আগের মতো সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকাই রয়েছে, পিপিএফের মতো দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়নি। অন্য দিকে ব্যাংকের মেয়াদি আমানতের সুদের উপর করছাড়ের প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী বিবেচনা করেননি।

বাজেটে একটি যুগান্তকারী ঘোষণা হল ব্যাংকগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সম্পদ সংগ্রহের (আমানত বা বন্ড) অনুমতি দেওয়া। বর্তমানে ব্যাংকগুলি ২০ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণ দিলেও আমানতের ক্ষেত্রে এই সীমা সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং এর ফলে তাদের সম্পদ ও দায়ের অসমতা লক্ষ করা যায়। এই ঘোষণায় এই অসমতা দূর হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির তহবিল পরিচালনার কাজ (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) সহজ হবে।

বাজেটে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেমন বেসরকারি ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ব্যাংক (ইউনির্ভাসাল ব্যাংক) গঠন করা এবং এ ব্যাপারে সরকারের তরফে অনুমতি দিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা। এছাড়া ছোট ব্যবসায়ী, অসংগঠিত ক্ষেত্র, স্বল্প আয়ের পরিবার কৃষক, পরিযায়ী কর্মী—এই সব মানুষের সুবিধার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের ব্যাংক, পেমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে।

ব্যাংক শিল্পে বাজেটের সার্বিক প্রভাব

অর্থনীতির সার্বিক বিকাশ ব্যাংকিং শিল্পকে প্রভাবিত করে। বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া এবং উৎপাদন শিল্পে জোয়ার আনার মধ্য দিয়ে আর্থিক বৃদ্ধিকে গতিশীল করাই সরকারের লক্ষ্য। লক্ষ্যপূরণে ব্যাংকগুলিকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নত মানের ব্যাংকিং পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। অন্য দিকে অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতকে দাঁড় করাতে প্রয়োজন বৃহৎ ব্যাংক। কারণ ছোট ব্যাংকের পক্ষে বিদেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে লেনদেন চালানো সম্ভব নয়। বাজেটে সংস্কার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে কয়েকটি সরকারি ব্যাংককে পারস্পরিক মিলিয়ে দিয়ে বৃহৎ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। গত দীর্ঘ সময়ে দেশে নতুন কোনও ব্যাংকও গড়ে ওঠেনি এবং পূর্বতন সরকার তাদের মেয়াদের শেষ পর্বে মাত্র দু'টি সংস্থাকে নতুন ব্যাংক খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়াও সংস্কার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে রয়েছে ব্যাংকের শেয়ারের মোটা অংশ সাধারণ পাবলিকের কাছে বিক্রি করা, বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট ব্যাংক গঠন করে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের প্রয়োজন মেটানো, দীর্ঘমেয়াদি আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকাঠামো ঋণের সংস্থান করা প্রভৃতি পদক্ষেপ। তবে ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদ কম থাকায় সংস্কার প্রক্রিয়ায় কিছুটা হলেও আঘাত আসছে এবং ব্যাংকগুলি সমালোচিত হচ্ছে যে তারা একজোট হয়ে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলছে। কারণ সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদের বিনিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষিত হলেও ব্যাংকগুলি সুদ বাড়াতে গড়িমসি করছে এবং এর ফলে গরিব মানুষরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

অর্থমন্ত্রী বাজেটে সামাজিক ব্যাংকিং সম্পর্কিত এক গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন। বাজেটে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, আবাসন শিল্প, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে সহযোগী করে এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ বাজেটে ব্যাংকিং সংস্কারের সঙ্গে সামাজিক ব্যাংকিংকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।❑

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫

করবিন্যাস ও তার বিশ্লেষণ

এবারের বাজেটের করবিন্যাসের প্রতি নজর রাখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা হালকা রেখেও রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে দেশের আর্থিক অবস্থাকে যথাসম্ভব স্থিতিশীল করে তোলার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তবে এই ভারসাম্যের পথে হাঁটলে দেশের ও দেশের মানুষের সত্যিকারের মঙ্গল কি সাধিত হবে? লিখছেন **ড. চিত্তরঞ্জন সরকার।**

বাজেট মানে প্রত্যাশা—কর দায় কম হওয়ার প্রত্যাশা করদাতাদের দিক থেকে এবং কর আদায় বেশি করার প্রত্যাশা সরকারের পক্ষে। সাধারণ করদাতারা করবোঝায় ভারাক্রান্ত—আয়ের অনেকটাই তাদের চলে যায় কর দায় মেটাতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে অতিরিক্ত ব্যয় মেটানো ইত্যাদিতে। এছাড়াও, সাধারণভাবে করদাতারা করপ্রদানে উৎসাহী হন না যেহেতু করপ্রদান একমুখী। সরকারকে করপ্রদানের জন্য সরকারের কাছ থেকে তাঁরা কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পান না—অন্তত প্রত্যক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে তাঁরা সরকারি সুবিধা যে ভোগ করেন না তা নয়, জনকল্যাণে সরকারি তহবিল থেকে অর্থব্যয়, জনসাধারণের জন্য পরিকাঠামোক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় ও অনুদান, সরকারি সাহায্য, ভরতুকি ইত্যাদি তারা অবশ্যই ভোগ করেন—যদিও তা সমাজের সকলেই ভোগ করেন—যিনি কর বেশি দেন, কর কম দেন বা আদৌ কর দেন না এরকম সকলেই। ফলে, করপ্রদানে করদাতারা সততই কম আগ্রহী হন।

এদিকে সরকারি তহবিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল কর বাবদ রাজস্ব আদায়। কারণটা খুবই স্বাভাবিক—যেহেতু কর আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতে সরকারের কোনও দায় বৃদ্ধি হয় না, সংগৃহীত কর ফেরতযোগ্য নয়—অবশ্য যদি তা সঠিক ও ন্যায়সংগত হয়। ঋণ নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি মেটানো যায় কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির পরিপন্থী এবং তা মঙ্গলজনকও নয়। ঋণ নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা খুবই বিপজ্জনক কারণ এর ফল দীর্ঘমেয়াদি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মোটা অঙ্কের ঋণ পরিশোধ ছাড়াও নিয়মিতভাবে সুদবাবদ অর্থপ্রদান করতে হয়—এতে অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে ঋণের বোঝা জনসাধারণকেই বইতে হয়।

এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী মাননীয় অরুণ জেটলি তাঁর প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে ২০১৪-১৫ আর্থিক বৎসরের জন্য যে করবিন্যাস দেখিয়েছেন তাতে কমবেশি দুপক্ষই খুশি—যদিও তা প্রত্যাশা মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মতো দেশ, যেখানে জন-বিস্ফোরণ একটা বিরাট সমস্যা, সেখানে করদাতাদের খুশি করার জন্য যথেচ্ছ কর ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তা করলে কর আদায়ের পরিমাণ ও করের ভিত খুবই সংকুচিত হবে যার ফলে সরকারের পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজ ও পরিষেবা প্রদান করা ব্যাহত হয়ে পড়বে উপযুক্ত তহবিলের অভাবে। একটি সুস্থ অর্থনীতির কাছে এটা কখনওই কাম্য নয়। এমতাবস্থায়, সামগ্রিকভাবে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে বেশ কিছু করছাড়ের ঘোষণা করেছেন করদাতাদের খুশি করতে এবং কিছু ক্ষেত্রে কর আদায় বাড়ানোর পক্ষেও লোকসভায় প্রস্তাব পেশ করেছেন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কথা ভেবে। যদিও করের হার বা কাঠামোয় তিনি কোনও রদবদল করেননি। এই করবিন্যাসের ফলে বাজেটে ঘাটতি বাড়বে যার জন্য স্বাভাবিকভাবেই সরকারকে ঋণ নিতে হবে। বাজেটে এবার সরকারি ভরতুকির পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে—গত ২০১৩-১৪ বাজেটে যেখানে ভরতুকি ছিল ২ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা, তা এবারের বাজেটে বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা।

আয়কর

২০১৪-১৫ আর্থিক বৎসরের বাজেটে আয়কর হারে কোনও পরিবর্তন না করলেও সাধারণ করদাতাদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী করযোগ্য আয়ের প্রাথমিক ছাড় যা আগে ছিল ২ লক্ষ টাকা তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করেছেন অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক সাধারণ করদাতাদের জন্য। প্রবীণ করদাতা যাদের বয়স ৬০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে এই ছাড় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অবশ্য অতি প্রবীণ করদাতা যাদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এই ছাড় আগের মতোই অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকাই আছে। সাধারণ করদাতাদের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক ছাড়ের বৃদ্ধি যেখানে ২৫ শতাংশ (আগের ২ লক্ষ টাকার সাপেক্ষে এখন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা বেশি), সেখানে প্রবীণ করদাতাদের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক ছাড়ের বৃদ্ধি হার ২০ শতাংশ (আগের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সাপেক্ষে এখন ৩ লক্ষ টাকা,

৫০ হাজার টাকা বেশি)। এর সঙ্গে বাজেটে ৮০সি ধারায় বিনিয়োগের উপর (জীবনবিমার প্রিমিয়াম প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে জমা ইত্যাদি বাবদ) ছাড়ের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ করদাতারা বেশ খানিকটা কর সাশ্রয় করতে পারবেন এবং আরও বেশি পরিমাণে সঞ্চয়ে আগ্রহী হবেন। ৮০সি ধারায় এই অতিরিক্ত ছাড় ভোগ করার সুবাদে সাধারণ করদাতা যাদের বার্ষিক মোট আয় ৪ লক্ষ টাকা তাঁরা কমপক্ষে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়মমাফিক ৮০সি ধারা অনুযায়ী বিনিয়োগ করলে আয়কর থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবেন। শিক্ষাসেস ও সারচার্জ আগের মতোই রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে।

যদি কোনও করদাতা ৮০সি ধারায় সঞ্চয়/ বিনিয়োগ আদৌ না করেন তাহলে সারণি-১ থেকে দেখা যায় যে নতুন নিয়মে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক মোট আয়ের ক্ষেত্রে কর সাশ্রয় হবে ৫১৫০ টাকা। কিন্তু ১ কোটি টাকার বেশি আয়ের ক্ষেত্রে কর সাশ্রয় হবে ৫৬৬৫ টাকা।

সারণি-১
অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক করদাতা (যারা ৮০সি ধারায় কোনও বিনিয়োগ করেননি) নতুন বাজেট অনুযায়ী তাদের কর সাশ্রয়

(টাকার অঙ্কে)

মোট আয়	বাজেট পূর্ব কর দায় (শিক্ষাসেস সহ)	নতুন বাজেট অনুযায়ী কর দায় (শিক্ষাসেস সহ)	কর সাশ্রয়
২,০০,০০০	—	—	—
২,৫০,০০০	৫,১৫০	—	৫,১৫০
৫,০০,০০০	৩০,৯০০	২৫,৭৫০	৫,১৫০
১০,০০,০০০	১,৩৩,৯০০	১,২৮,৭৫০	৫,১৫০
১,০০,০০,০০০	২৯,১৪,৯০০	২৯,০৯,৭৫০	৫,১৫০
১,০০,০০,০০১	৩২,০৬,৩৯০*	৩২,০০,৭২৫*	৫,৬৬৫

*১০ শতাংশ সারচার্জসহ করযোগ্য আয় ১ কোটি টাকার বেশি হওয়ার জন্য।
উৎস : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫ থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত

নতুন নিয়মে ২০১৪-১৫ সালের বাজেট অনুযায়ী কেবলমাত্র ৮০সি ধারায় পুরো ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে করদাতারা আগের থেকে কত পরিমাণ কর কম দেবেন বা তাঁদের কত পরিমাণ কর সাশ্রয় হবে তা সারণি-২ এ দেখানো হল।

এছাড়াও করদাতারা গৃহঋণের উপর প্রদত্ত সুদবাবদ আগের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ছাড়ের পরিবর্তে নতুন বাজেটে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয় থেকে ছাড় পাবেন এবং এর ফলে তাঁরা আরও বেশি কর সাশ্রয় করতে পারবেন।

সারণি-২ থেকে দেখা যায় যে অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক করদাতাদের ক্ষেত্রে পুরানো বাজেট অপেক্ষা নতুন বাজেটে সর্বাধিক কর

সারণি-২
অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক করদাতাদের নতুন বাজেট অনুযায়ী কর সাশ্রয়

(টাকার অঙ্কে)

বার্ষিক মোট আয় (ক)	বাজেট পূর্ব (৮০সি ধারায় পুরো বিনিয়োগ ছাড় জনিত) করযোগ্য আয় [(ক) ১ লক্ষ টাকা]	নতুন বাজেট অনুযায়ী (৮০সি ধারায় পুরো বিনিয়োগ ছাড় জনিত) করযোগ্য আয় [(ক) ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা]	বাজেট পূর্ব কর দায় শিক্ষাসেস সহ (+ অতিরিক্ত *১০ শতাংশ সারচার্জ) (খ)	নতুন বাজেট অনুযায়ী কর দায় শিক্ষাসেস সহ (+ অতিরিক্ত *১০ শতাংশ সারচার্জ) (গ)	নতুন বাজেটে কর সাশ্রয় (ঙ = খ—গ)
৪,০০,০০০	৩,০০,০০০	২,৫০,০০০	১০,৩০০	—	১০,৩০০
৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৫০,০০০	২০,৬০০	১০,৩০০	১০,৩০০
৬,০০,০০০	৫,০০,০০০	৪,৫০,০০০	৩০,৯০০	২০,৬০০	১০,৩০০
৬,৫০,০০০	৫,৫০,০০০	৫,০০,০০০	৪১,২০০	২৫,৭৫০	১৫,৪৫০
৮,০০,০০০	৭,০০,০০০	৬,৫০,০০০	৭২,১০০	৫৬,৬৫০	১৫,৪৫০
১০,০০,০০০	৯,০০,০০০	৮,৫০,০০০	১,১৩,৩০০	৯৭,৮৫০	১৫,৪৫০
১১,৫০,০০০	১০,৫০,০০০	১০,০০,০০০	১,৪৯,৩৫০	১,২৮,৭৫০	২০,৬০০
২০,০০,০০০	১৯,০০,০০০	১৮,৫০,০০০	৪,১২,০০০	৩,৯১,৪০০	২০,৬০০
৫০,০০,০০০	৪৯,০০,০০০	৪৮,৫০,০০০	১৩,৩৯,০০০	১৩,১৮,৪০০	২০,৬০০
১,০০,০০,০০০	৯৯,০০,০০০	৯৮,৫০,০০০	২৮,৮৪,০০০	২৮,৬৩,৪০০	২০,৬০০
১,০০,০০,০০১	৯৯,০০,০০১	৯৮,৫০,০০১	৩০,৮৮,৪০০	৩০,৭১,৮৫৫	১৬,৫৪৫

*১০ শতাংশ সারচার্জসহ করযোগ্য আয় ১ কোটি টাকার বেশি হওয়ার জন্য
উৎস : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫ থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত

সাশ্রয় হয় ১০৩০০ টাকা যখন মোট বার্ষিক আয় (৮০সি ধারায় ছাড় বাদ দেওয়ার আগে) ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকে। এই কর সাশ্রয় হয় ১৫৪৫০ টাকা যখন মোট আয় (৮০সি ধারায় ছাড় বাদ দেওয়ার আগে) দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে। আবার ৮০সি ধারায় ছাড় বাদ দেওয়ার আগে যদি মোট আয় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে থাকে তখন কর সাশ্রয় হয় ২০৬০০ টাকা। ৮০সি ধারায় ছাড় বাদ দেওয়ার আগে যদি মোট আয় ১ কোটি টাকার বেশি হয় তাহলে কর সাশ্রয় হয় ১৬৫৪৫ টাকা। এই একই পরিমাণ কর সাশ্রয় হবে প্রবীণ করদাতাদের ক্ষেত্রেও।

সঞ্চয় প্রকল্প

ভারতীয় অর্থনীতিতে বেশ কয়েক বছর ধরে সঞ্চয়ে ক্রমাগত অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে এবং তা কমতে কমতে জি ডি পি-র প্রায় ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরে। এমতাবস্থায় জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবারের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৮০সি ধারায় আগে যেখানে করদাতারা জীবনবিমা, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প, ভবিষ্যনিধি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করলে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পেতেন তা ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে, করদাতাদের কর সাশ্রয় হবে এবং তাঁরা ৮০সি ধারার সুযোগ নিয়ে আরও বেশি সঞ্চয় করতে পারবেন। এছাড়াও করদাতাদের বেশি করে সঞ্চয়মুখী করার জন্য কিষাণ বিকাশ পত্র-কে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই জনপ্রিয় স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পটি ২০১১ সালে তুলে নেওয়া হয়েছিল। এটি পুনরায় চালু করায় করদাতারা খুশি হবেন কারণ এটিতে বিনিয়োগ করা সহজ, স্বল্পমেয়াদি বলে তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ ফেরত পাওয়া যায় এবং সর্বোপরি ৮০সি ধারার সাপেক্ষে করসাশ্রয়কারী যোজনা। এবারের বাজেটে কিষাণ বিকাশ পত্র পুনরায় চালু করা ছাড়াও জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের বিমার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে তারা আরও বিনিয়োগমুখী হবেন বলে আশা করা যায়।

স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্প নিম্ন ও মাঝারি আয়করদাতাদের কাছে খুবই পছন্দের—কারণ ৮০-সি ধারার মাধ্যমে এই স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে একদিকে যেমন করের বোঝা থেকে অনেকটাই রেহাই মেলে তেমনি এর মাধ্যমে প্রণোদিত সঞ্চয়েরও সুযোগ ঘটে। স্বল্প আয় অর্জনকারী করদাতারা অনেক সময়েই উপযুক্ত সঞ্চয়ের সন্ধানের অভাবে আয়ের বেশিরভাগটাই খরচ করে ফেলেন। স্বল্পসঞ্চয়ের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প থাকায় করদাতাদের সঞ্চয় মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে এবং করের বোঝা হ্রাস পাবে। এর ফলে তাদের কর দায় কম হবে ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি বাড়বে।

আবাসন শিল্প

আবাসন শিল্প বর্তমান সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়নের সঙ্গে তাল রেখে শহরাঞ্চলে বসবাসের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে সমাজের সকলের জন্য মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করা যেমন জরুরি, তেমনি কঠিন হয়ে উঠছে। করদাতাদের গৃহসম্পদ ক্রয় বা নির্মাণে উৎসাহ দিতে এবারের বাজেটে গৃহঋণের সুদ বাবদ কর ছাড় আগের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এতে করদাতারা গৃহঋণ বাবদ অতিরিক্ত কর ছাড় পাওয়ার লক্ষ্যে আবাসনশিল্পে বেশি আগ্রহী হবেন—ফলে একদিকে যেমন বেশি করে গৃহসম্পত্তি গড়ে উঠবে তেমনি সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে, সামাজিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে আর সেই সঙ্গে গৃহসমস্যারও সমাধান হবে। করদাতারা যাতে বেশি মাত্রায় গৃহঋণ পেতে পারেন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এবারের বাজেট ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক-এ (এন এইচ বি) বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গ্রামীণ আবাসন শিল্পকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ৮০০০ কোটি টাকা ও শহরাঞ্চলের আবাসনের জন্য ৪০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ যোজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবাসন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি, দিনমজুর, কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থা ও নানান ছোটবড় শিল্প। আবাসন শিল্পে যত বেশি মাত্রায় বিনিয়োগ হবে, কর্মসংস্থান তত বৃদ্ধি পাবে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। বিভিন্ন ছোটখাট কলকারখানা, যেগুলি আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত ও সরবরাহ করে, তারাও ব্যবসা করে লাভবান হবে। সামগ্রিকভাবে আবাসন শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই কমবেশি উপকৃত হবেন।

কোম্পানি কর

কোম্পানি কর ব্যবস্থায় কোনও রদবদল এবারের বাজেটে করা হয়নি। ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার আগের মতোই ৩০ শতাংশ ও করযোগ্য আয় ১০ কোটির বেশি হলে সারচার্জ ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার এবং সারচার্জও আগের মতোই আছে। কিন্তু এবারের বাজেটে আয়কর আইনের ১১৫-ও ধারায় লভ্যাংশ প্রদানের উপর কর (ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স) এর ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে যেখানে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স ধার্য হত ঘোষিত ও নিট প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর প্রায় ১৭ শতাংশ হারে এখন থেকে তা ধার্য হবে মোটের উপর। এর ফলে কোম্পানি কর আদায় বৃদ্ধি পাবে।

মূলধন বিনিয়োগে ছাড়

দেশি শিল্পকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহিত করতে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে ১০০ কোটি বিনিয়োগ করলে তবেই অতিরিক্ত লগ্নিজনিত ছাড় (ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাওয়েন্স) অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ হারে অবচয় ধার্য করার সুযোগ দেওয়া হত, এখন ওই বাবদ লগ্নি ২৫ কোটি করলেই তা পাওয়া যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আরও বেশি সুবিধা দিতেই এটি করা হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নতি লাভ করবে, সমৃদ্ধিশালী হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

পরোক্ষ কর

করদাতাদের বিভিন্ন প্রকার করছাড় দেওয়ার জন্য সরকারের সম্ভাব্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে পরোক্ষ কর থেকে অতিরিক্ত ৭ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০১৪-১৫ সালের বাজেট বরাদ্দে। কিছু বিশেষ পণ্য যেমন পানমশলা, সিগারেট,

গুটখা ইত্যাদিতে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে এবং পরিষেবা করের পরিধি বাড়িয়ে এই অতিরিক্ত কর আদায় করা হবে বলে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব রেখেছেন। এভাবে ঘাটতি মেটাবার চেষ্টা চালিয়েও নিট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা।

প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষকর সরকারি রাজস্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকারের মোট আয়ের ১৯ শতাংশ আসে উৎপাদন শুল্ক ও আমদানি শুল্ক থেকে এবং ১০ শতাংশ আসে পরিষেবা কর থেকে। পরোক্ষ করের এই তিনটি ক্ষেত্রে তাদের মূল করহারে কোনও তারতম্য করা হয়নি এবারের বাজেটে। কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে রাজকোষ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে এই বাবদ করহারে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে।

সিগারেট, চুরুট, পানমশলা, গুটখা ইত্যাদি স্বাস্থ্যহানিকর ভোগ্যপণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানো হয়েছে ১১ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশ পর্যন্ত। এর ফলে, একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় বাড়বে, অন্যদিকে উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর কারণে স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। যার ফলে এই সকল ক্ষতিকারক ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমবে। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষের ক্যানসার ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ কমবে। সমাজ অনেক বেশি স্থিতিশীল হবে। ঠান্ডা পানীয়, রঙিন পানীয়, রাসায়নিক মিশ্রিত ফলের রস ইত্যাদি যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তাতে শুল্ক ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। দামি জুতোর উপর থেকে উৎপাদন শুল্ক ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশ করা হয়েছে বাজেটে। এল ই ডি ও এল সি ডি টিভির ক্ষেত্রে (১৯ ইঞ্চির কম পর্দাযুক্ত টিভিতে) আগে যেখানে ১০ শতাংশ শুল্ক নেওয়া হত তা এবারের বাজেটে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই ধরনের টিভির অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপর করছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্যের বাজার চাঙ্গা হবে এবং টিভি নির্মাণকারী সংস্থাগুলির বাণিজ্য বাড়বে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং কর্মসংস্থান বাড়বে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার

সামগ্রিকভাবে দেশীয় অর্থনীতি ঋণভারে ও জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। কর্মসংস্থানের অভাবে দেশে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান। রাজকোষে বিপুল ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে সংকট, বিদেশি বাণিজ্য স্থিতিশীল, ক্রমবর্ধমান বিদেশি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সব মিলিয়ে গোটা অর্থনীতি ও সমাজ প্রায় স্তব্ধ। খুব শক্ত হাতে অর্থনীতির হাল ধরতে না পারলে সংকট এড়ানো সহজ নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নমুখী করতে হবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে কর ছাড়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কর ব্যবস্থাকে আরও বেশি স্বচ্ছ এবং কার্যকরী করে তুলতে হবে, জনসাধারণকে দেশের স্বার্থে করপ্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে দেশ ও সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রয়াসগুলি প্রকৃত ফলপ্রসূ হতে পারে।❑

WBCS ই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়

প্রিলি আটকাবে না, যদি

- প্রশ্নের প্যাটার্ন ধরতে পার -এ বারবার ঠেকে না যায়
- সহজ ফ্রিকোয়েন্ট জোন ধরতে পার। ১০৫ - ১০
- প্রশ্ন দাগাতে কনফিউশন না হয়।

মেন হবে, যদি

- সায়েন্স ও টেকনলজিতে অ্যাপ্লায়েড অংশে, RBI -তে Exim Control, Capital
- formation থেকে কনসেপ্টচুয়্যাল প্রশ্ন তৈরী কর।
- অপশনালে নিজস্বতা তৈরী কর।
- সবচেয়ে বড় কথা, মেন -এর জন্য Same Pattern এবং Same Standard এর অন্য পরীক্ষার প্রশ্ন (IAS নয়) একটু খুঁজলেই পাবে। এটা দেখে নিও।

C/o ডেভিড স্যার

মোটামুটি তৈরী অথচ সামান্য গাইড পেলেই হবে যাদের তারা পেপার চেক্ বা গাইড এর জন্য ইন্টার অ্যাকশন ক্লাসে আসতে পারে।

5 টিচার্স গ্রুপ

প্রিলি-মেন-অপশনাল-পোস্টালের জন্য ফোন করেই দেখ না।

9593411432 দমদম-নবদ্বীপ-বর্ধমান (সন্ধ্যায়ও ক্লাস হয়)

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫

পরিকাঠামো ক্ষেত্র

শিল্পোন্নয়ন ও আর্থিক বৃদ্ধিহারকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবারের বাজেটে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেশকিছু নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে অনেকটা করে টাকা। পরিকল্পনাতেও রয়েছে অভিনবত্ব। কিন্তু পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গৃহীত এ সমস্ত প্রকল্প ঠিক কতদূর সফলভাবে রূপায়িত হবে বা হবে না, এ নিয়ে রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মনে নানা সন্দেহ। কেন—তা লিখছেন **ভব রায়।**

এবারের বাজেটের (২০১৪-১৫) যে কোনও বিষয়ের উপর আলোচনার পটভূমিতে দুটি বিশেষ প্রাসঙ্গিকতাকে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথম, টানা দশ বছর একই রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতায় থাকার পরে পালাবদল ঘটেছে। সেই সূত্রে, ভিন্ন রাজনৈতিক দল তথা জোটের তরফে এটাই প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বাজেট। এবং সে কারণে, এই বাজেটে, জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-নির্দেশিকার বহুলাংশে প্রতিফলন ঘটাবে—এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, নতুন অর্থমন্ত্রীকে এই বাজেট পেশ করতে হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন জাতীয় অর্থনীতি সাম্প্রতিক তিন-চার বছরে, নানাক্ষেত্রে গভীর, সংকটে জর্জরিত হয়ে রয়েছে। এইসব সমস্যার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে নিম্নতর আর্থিক বৃদ্ধির (জিডিপি) হার, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, নিচু হারে শিল্পোৎপাদন, কৃষিক্ষেত্রে নানা সংকট, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় রাজকোষ ঘাটতিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে না পারা, বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল অবস্থা ইত্যাদি। অর্থমন্ত্রীও বাজেট প্রতিবেদন পেশ করার সময়ে এই সমস্যাবলি মাথায় রেখেই ঘোষণা করেছেন একটি ভারসাম্যযুক্ত বাজেট প্রস্তাব পেশ করার এই ভাষায়, "India unhesitatingly wants to grow. Those living below the poverty line are anxious to free themselves from the curse of poverty...we look forward to lower levels of inflation...the country is in no mood to suffer unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure apathetic governance."

স্পষ্টতই লক্ষণীয়, জিডিপি-বৃদ্ধি, দারিদ্র-নিরসন, মূল্যস্ফীতিরোধ, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো-উন্নয়ন—এসব কিছুরই সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবারের বাজেটে, যেটিকে অন্তত কাগজে-কলমে একটি সুষম 'ভারসাম্যের প্যাকেজ' হিসেবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

পরিকাঠামোক্ষেত্র

বর্তমান বাজেট প্রস্তাবটিকে খুঁটিয়ে বিচার করলে একথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় অর্থনীতির 'রক্তসংবহন-চক্র' হিসেবে চিহ্নিত যে ক্ষেত্রটি, সেই পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টির উপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশব্যাপী পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিকে প্রায় আমূল ঢেলে সাজিয়ে বহুমুখী ও মৌলিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাও রয়েছে এবারের বাজেট প্রস্তাবে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে এই বাড়তি গুরুত্ব দানের বিষয়টি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ-সমীক্ষক-উদ্যোগপতি ও নানা মহলের পর্যবেক্ষণেও ধরা পড়েছে। এরকম বেশকিছু ইতিবাচক অভিমতের মধ্যে, দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে একটি তুলে ধরা হচ্ছে। বিশিষ্ট অর্থনীতি-সমীক্ষক অজয় শ্রীনিবাসন মন্তব্য করেছেন, "Not surprisingly, the key focus of the new government seems to be on infrastructure development. The budget has laid out a broad road map and allocated resources to a number of infrastructure sectors such as highways, sports, smart cities, low cost housing, gas pipelines and river transportation." (দি টেলিগ্রাফ ১২ জুলাই ২০১৪) অর্থাৎ, এবারের বাজেটে, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিকাঠামোক্ষেত্রটিকে রীতিমতো বহুব্যাপ্ত ও উদ্ভাবনামূলকভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত করে তোলা হবে। সেখানে থাকবে হাইওয়ে সম্প্রসারণ, স্মার্ট সিটি, বন্দর উন্নয়ন থেকে নিম্ন ব্যয়ের আবাসন প্রকল্প, নদী পরিবহণ পরিকল্পনা ইত্যাদি।

আসলে, এবারের বাজেট প্রস্তাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিকে এমনভাবে ভাবা ও পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে ক্রমশ কমতে থাকা শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করে তোলা যায় এবং সেইসঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রভাব যাতে জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইতিবাচকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে আর্থিক বৃদ্ধির হারকে বাড়িয়ে তুলতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রও নিশ্চিতভাবেই সার্থক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এখন দেখা যাক, বাজেট প্রস্তাবে ঠিক কী ধরনের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা রয়েছে

পরিকাঠামোক্ষেত্র সম্পর্কে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বা 'পরিকাঠামো' শিরোনামের বাইরেও বাজেটের অন্যান্য প্রসঙ্গে এমন কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যা পরোক্ষভাবে পরিকাঠামো সম্প্রসারণেরই আনুষঙ্গিক বা পরিপূরক। যাই হোক, আপাতত পরিকাঠামো-বিষয়ক প্রস্তাব-গুলিকেই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে :

(১) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনার ভূমিকায় সরকারি-বে-সরকারি-অংশীদারত্বের (পিপিপি) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, ভারতের উন্নয়নে ৯০০-রও বেশি পিপিপি প্রকল্প সক্রিয় রয়েছে, যা বিশ্বে বৃহত্তম। বিশেষত, ভারতের বিমানবন্দর, বন্দর ও হাইওয়ে-উন্নয়নে এই ধরনের প্রকল্পগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা সারা বিশ্বের কাছেই 'মডেল' হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব প্রকল্পের কিছু খামতিও দেখা গিয়েছে। সেইসব খামতি দূর করার জন্য এবং আগামী দিনে এই ধরনের প্রকল্পকে আরও জোরদার করার জন্য 'এপি ইন্ডিয়া' নামে, ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দে, একটি জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) জাহাজ শিল্প (শিপিং) ও বন্দর সম্প্রসারণের বিষয়টিকে মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অধিকতর কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ বছরেই ১৬টি নতুন বন্দর স্থাপন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়-১-এর অধীনে, টিউটিকোরিনে বন্দর-বহির্ভূত প্রকল্পের (আউটার-হারবার প্রজেক্ট) উন্নয়নের জন্য ১১,৬৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

(৩) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশব্যাপী বিমান সংযোগ অধিকতর সম্প্রসারিত হলেও আজও অসংখ্য ভারতবাসীর কাছে এই সুবিধা নাগালের বাইরেই রয়েছে। তাই, 'টায়ার-১' ও 'টায়ার-২' পর্যায়ে, ভারতের বিমান বিভাগ অথবা পিপিপি উদ্যোগে দেশব্যাপী আরও নতুন বিমান বন্দর গড়ে তোলা হবে বর্তমান বছরে।

(৪) পরিকাঠামো-বিষয়ক বাজেট প্রস্তাবে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সড়ক নির্মাণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রটিতে। এই উদ্দেশ্যে, ভারতের জাতীয় হাইওয়ে অথরিটি ও রাজ্য-সড়ক বিভাগ খাতে ৩৭,৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বছরের সময়সীমায় ৮৫০০ কিলোমিটার নতুন হাইওয়ে নির্মাণের টার্গেটও স্থির করা হয়েছে। শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরের উন্নয়নের পরিপূরক ও সহায়ক রূপে এবং দেশের বিভিন্ন অতি দূরবর্তী স্থানের মধ্যে অতি দ্রুত পণ্য পরিবহণের জন্য কয়েকটি বিশেষ এক্সপ্রেস-হাইওয়ে নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে—এই বিশেষ সড়ক-প্রকল্পের জন্য ৫০০ কোটি টাকা আলাদাভাবে সরিয়ে রাখা হবে ভারতের জাতীয় হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে।

(৫) এবারের বাজেট প্রস্তাবিত পরিকাঠামো উন্নয়নে একটি প্রায়-নতুন উদ্যোগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; সেটি হল নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি (নিউ অ্যান্ড রি-নিউয়েবল এনার্জি)। চলতি বছরে এই ক্ষেত্রটিতে রূপায়িত হবে, এরকম বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল—রাজস্থান, গুজরাত, তামিলনাড়ু ও লাদাখে অতিবৃহৎ সৌরশক্তি প্রকল্পের (আল্ট্রা মেগা সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট) নির্মাণ, এক লক্ষ পাম্পসেটে প্রয়োজনীয় সৌরশক্তি সরবরাহের জন্য ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলা এবং সারা দেশ জুড়ে সাধারণ কৃষকদের জন্য সৌরশক্তিচালিত পাম্প সেট উৎপাদন প্রকল্প। পৃথক পৃথক কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ পৃথকভাবে বরাদ্দকৃত অর্থের মোট পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা।

(৬) সারা দেশে গ্যাস পাইপ লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। দেশে ইতিমধ্যে ১৫০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপ লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে। আগামী দিনে আরও অতিরিক্ত ১৫০০ কিলোমিটার লাইন সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হবে, যাতে গোটা দেশ জুড়ে একটি সর্বাত্মক 'গ্যাসগ্রিড' পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের সুরাহা হবে, অন্যদিকে শিল্পোৎপাদন-আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেও বাড়তি সুবিধা মিলবে। তাছাড়া, গ্যাস তথা জ্বালানির একটিমাত্র উৎসের উপর নির্ভরশীলতাও কমবে। গ্যাস পাইপ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের রূপায়ণের সিংহভাগই পরিচালিত হবে 'পিপিপি' উদ্যোগে—এরকমই প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

এছাড়াও কয়লা, অন্যান্য খনিসম্পদ, শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত এমন কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যেগুলি পরোক্ষভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের সামগ্রিক সম্ভাব্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প ও বৃদ্ধি : সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রত্যাশিত সুফল

পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলি নিছক পড়ে হয়তো ততটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে না, এই কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ প্রক্রিয়ার ধরন-ধারণ এবং কীভাবেই বা এগুলি শিল্প সহায়ক বা বৃদ্ধি অভিমুখী ভূমিকা পালন করবে। আসলে, এ কথা তো মানতেই হয়, এবারের পরিকাঠামো উন্নয়নী প্রস্তাবগুলি, অন্তত ঘোষিত শব্দালংকারের এতটাই নতুন ধরনের যে, সাধারণের পক্ষে তার খুঁটিনাটি সবটাই বুঝে ওঠা প্রকৃতই দুরূহ। তাই, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রস্তাবসমূহের সম্ভাব্য প্রকরণ ও প্রভাব নিয়ে কিছু কিছু সমীক্ষাও করেছেন ও এখনও করে চলেছেন। এখানেও সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে একনজরে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আরও কিছু পরিকাঠামো উন্নয়নী প্রস্তাব : নতুন রূপে, বহুমুখী তাৎপর্যে

বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র পূর্ববর্তী ছকবন্দি তালিকার মধ্যেই পরিকাঠামো সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাবের সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে নেই। গুরুত্বপূর্ণ বাজেট প্রস্তাবগুলি রূপায়ণে সরকারি পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে ওই তালিকায়। কিন্তু, এগুলির বাইরেও সরকার এমন কিছু পরিকাঠামো প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন, যেগুলির গুরুত্ব খুব কম নয়।

এই পর্যায়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গ্রামীণ পরিকাঠামো সম্প্রসারণ খাতে বিভিন্ন বাজেট প্রস্তাব। অন্যান্য বারের বাজেট প্রস্তাবে সাধারণত অগ্রাধিকার থাকত গ্রামীণ

পরিকাঠামো উন্নয়নের। এবার হয়তো, সেভাবে জোর দিয়ে আলাদাভাবে 'গ্রামীণ' ক্ষেত্রটি উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু ভালো করে বাজেট প্রস্তাব বিচার করলে দেখা যাবে, গ্রামীণ পরিকাঠামোও বঞ্চিত হয়নি। ইতিপূর্বে গ্রামীণ ক্ষেত্রে যেসব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চালু রয়েছে, সেগুলিকে মোটামুটি বজায় রাখা হয়েছে।

বর্তমান বাজেট প্রস্তাব অনুসারী একটি অভিনব পরিকাঠামো প্রকল্প চালু হতে চলেছে ভারতের গ্রামে গ্রামে। এটির নামকরণ করা হয়েছে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রুরবান মিশন' (রুর‍্যাল ও আরবান সমন্বয়ে 'রুরবান'!), যার লক্ষ্য হল শহর পরিকাঠামোর সঙ্গে গ্রামীণ পরিকাঠামোর সমন্বয়সাধন। অর্থাৎ, এই প্রকল্পের সুবাদে গ্রামে বসেই মিলবে নগর জীবনের সুযোগসুবিধা। এর পাশাপাশি, এই প্রকল্পের সুবাদে গ্রামের মানুষদের দক্ষতা সৃজন ও আয় বাড়াবার সুযোগ মিলবে। গ্রামীণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আর একটি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে বর্তমান বাজেটে—'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা', যা গ্রামীণ ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের উন্নতির মাধ্যমে ২৪ × ৭ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করবে। এই প্রকল্পের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও, গ্রামীণ ভারতসহ সারা ভারতে নতুন জলবিভাজিকা পরিকাঠামো প্রকল্প 'নীরাঞ্চল'-এর খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২,১৪২ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, এবারের বাজেটে প্রস্তাবিত পরিকাঠামো উন্নয়নকে এমনভাবে পরিকল্পিত করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের মূলধন গঠনে ও আর্থিক বৃদ্ধির উন্নয়নেও প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে পারে। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে বাজেট প্রস্তাবে পরিকাঠামো-উন্নয়ন-বিনিয়োগ ও বিদেশি লগ্নির বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ সরকারের পরিকাঠামো উন্নয়নের সূত্রে এই ধরনের বহু উদ্দেশ্যসাধক পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ মতে, প্রস্তাবিত পরিকাঠামো-উন্নয়নের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, আবাসন-সড়ক-বন্দর ইত্যাদি নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিধি বাড়বে, শিল্পোৎপাদন উৎসাহিত হবে—সেই সঙ্গে মূলধনি বাজার, মূলধন গঠন ও ব্যাংকিং ব্যবসারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

একনজরে পরিকাঠামো উন্নয়নী বাজেট প্রস্তাব : সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রত্যাশিত সুফল

পরিকাঠামোর উপক্ষেত্র	পদক্ষেপ ও বরাদ্দ	সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রত্যাশিত সুফল
রাস্তা-সড়ক, বিমান বন্দর	২০১৪-১৫-তে ৮,৫০০ কিলো-মিটার হাইওয়ে নির্মাণ কর্মসূচি, মোট বরাদ্দ ৩৮,৩৮০ কোটি টাকা	প্রতিদিন গড়ে ২৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ (হাইওয়ে) লক্ষ্যমাত্রা, যা ২০১২-১৩-তে এনএইচএআই কর্তৃক সর্বোচ্চ গড়ে ৮ কিলোমিটার/প্রতিদিন-এর তিন গুণ। রাস্তা ও সেতু নির্মাণের জন্য ৩৭,৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ, যা কাঁচামালের চাহিদাকে চাঙ্গা করবে ও হাইওয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে। শিল্প-করিডর-বরাবর এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণের জন ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। টায়ার-১ ও টায়ার-২ নগরের জন্য নতুন বিমান বন্দর পরিকল্পনা।
স্মার্ট সিটি প্রকল্প	বাজেট বরাদ্দ ৭০৬০ কোটি টাকা, এই প্রকল্পের জন্য উদার বিদেশি বিনিয়োগ	মাঝারি ধরনের শহরগুলিকে আধুনিকতম সুযোগসুবিধাসহ 'স্মার্ট সিটি' হিসাবে উন্নীত করা এবং নতুন 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলা। নতুন নতুন শিল্প করিডরের সঙ্গে এই ধরনের নগরীর নৈকট্য ও সরাসরি সংযোগ-সাধন। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, পিপিপি মডেলের তত্ত্বাবধানে দেশের ৫০০টি শহর এলাকায় এই ধরনের স্মার্ট সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা।
শক্তি পুনরুজ্জীবন (পাওয়ার রিভাইভ্যাল)	বিদ্যুৎ প্রকল্পের (পাওয়ার প্রজেক্ট) নতুন উদ্যোগপতিদের জন্য কর-অবকাশ	২০১৭ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বণ্টন ও সঞ্চালনে অঙ্গীকারবদ্ধ কোম্পানিসমূহকে ১০ বছরের 'কর-ছুটি' দেওয়া হবে। এর ফলে, সমগ্র দেশবাসীকে ২৪ × ৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ লক্ষ্য সাধিত হবে সরকারের তরফে। এই ঘোষণার পরে লক্ষণীয়ভাবে, টাটা পাওয়ার, এনটিপিসি, ভেল ইত্যাদি কোম্পানির শেয়ারের দাম বাজারে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।
সবুজ শক্তি (গ্রিন এনার্জি)	সৌর ও বায়ুশক্তির প্রসারে ব্যাপক সুযোগসুবিধা মোট বরাদ্দ ১০০০ কোটি টাকা	অতি বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ বরাদ্দ। সেচ-খাল-বরাবর সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। সৌর সেচ-পাম্প-ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা। একটি 'গ্রিন এনার্জি করিডর' নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির নির্মাণ উপকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রদেয় পরোক্ষ কর ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে এই শিল্পটি উৎসাহিত হতে পারে। এবং উৎপাদিত এই শক্তি ব্যবহার সুলভ হতে পারে।
বিশেষ নগর পরিবহণ	নতুন পাতাল রেল প্রকল্প মোট বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা	লখনউ ও আমেদাবাদে মেট্রো প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রতিটি শহরখাতে ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে। লাইট রেল সিস্টেমসহ এইসব মেট্রো প্রকল্পে পিপিপি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করা হবে। ২০ লক্ষের অধিক জনবসতি সমৃদ্ধ বিভিন্ন শহরে মেট্রো রেল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

সূত্র : দি ইকনমিক টাইমস ১১ জুলাই ২০১৪।

তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত 'জলমার্গ বিকাশ' নামে নতুন নৌপথ ও গঙ্গা সংস্কারের পরিকল্পনার সিংহভাগই পরিকাঠামো উন্নয়নেরই অংশবিশেষ। এই প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য খরচ ৪২০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের সুবাদে, আগামী ৬ বছরের মধ্যে এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ১ নম্বর জাতীয় জলপথের ১৬২০ কিলোমিটার অংশের সংস্কার করা হবে। এবং এই সুদীর্ঘ জলপথে পণ্য পরিবহণেরও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থত, কৃষি তথা গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে, সেটি হল—ফসল, সবজি ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য দেশের গ্রামাঞ্চলে গুদাম গড়ে তোলা। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে গরিব ও মধ্যবিত্ত কৃষকের বছরভর ফসলের একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়— তাই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, অবশ্যই তা হয়ে উঠতে

পারে প্রকৃতই 'কৃষক-বান্ধব'। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০০০ কোটি টাকা। এরই পাশাপাশি, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহিত করতে প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং-এর যন্ত্রাংশের শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশ করা হয়েছে।

এইভাবে, বাজেট প্রস্তাবকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পকে এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, যা বহু উদ্দেশ্য সাধক 'প্যাকেজ' হিসাবে রূপায়িত হয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ করেও বৃহত্তর জাতীয় অর্থনীতিতেও বাড়তি পুষ্টি জোগাতেও সক্ষম হবে। এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক প্রতিবেদনেও ধরা পড়েছে এই ভাষায়, "দেশের আর্থিক এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা বলেছেন জেটলি। যেমন—ব্যাংকগুলিকে পরিকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে বলা হয়েছে। এর জন্য বাজার থেকে আমানত সংগ্রহের বিধি শিথিল করা হয়েছে। পরিকাঠামোয় অর্থের সংস্থান বাড়াতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রাস্ট এবং রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টে বিনিয়োগে কর ছাড়ের ব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। (প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী, আ.বা.প. ১১ জুলাই ২০১৪)

পরিকাঠামো সম্পর্কিত বাজেট প্রস্তাব: বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

এতখানি গুরুত্ব দিয়ে, সাম্প্রতিক কয়েক বছরের বাজেটে, পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে উপস্থাপিত করা হয়নি। তবে আগামী দিনে এইসব কর্মসূচির বাস্তবায়নের কথা ভাবলে কিছু আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার কালো মেঘও যেন ভেসে ওঠে। প্রথমেই যে আশঙ্কা জাগে, তা হল—'সাধ' ও 'সাধ্যে'-র সেই চিরাচরিত অপূরণীয় ফারাক! পিপিপি বা বিদেশি বিনিয়োগের ভূমিকা মাথায় রেখেও যে প্রশ্ন জাগে মনে—পরিকাঠামোর বহুবিস্তারী প্রস্তাবগুলি যথাযথ রূপায়িত করতে হলে যে বিপুল সরকারি অর্থের প্রয়োজন, ক্রমশ বেশি থেকে আরও বেশি রাজকোষ ঘাটতির প্রেক্ষিতেও ও দেশের বর্তমান সংকটগ্রস্ত অবস্থায় তা বহন করা কি আদৌ সম্ভব?

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত পরিকাঠামো উন্নয়নের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই যে পিপিপি ও বিদেশি বিনিয়োগের উপর অতি নির্ভরতা, তা কতটা বাস্তবোচিত ও যুক্তিযুক্ত? বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়টি তো পুরোপুরি অনিশ্চিত—সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার প্রবাহ আশানুরূপ হতেও পারে, আবার নাও পারে। আর সাম্প্রতিক কয়েক বছরে সরকার অনুমোদিত অনেক ক্ষেত্রেই পিপিপি-র ভূমিকা খুব সন্তোষজনক নয়। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এসএল রাও মন্তব্য করেছেন, "The private public partnership was an innovative idea, poorly implemented. There are over Rs. 2,50,000 crores of private infrastructure loans lying unserviced with banks." (দি টেলিগ্রাফ ১১ জুলাই ২০১৪)। অর্থাৎ, পিপিপি প্রকল্প ঘোষিত হলেই যে 'প্রাইভেট' বা বেসরকারি কোম্পানিরা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়বে সব ক্ষেত্রেই এটা নাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, আলোচ্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আবেগময় শব্দালংকারে ঘোষিত হলেও সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ এতটাই ছিটেফোঁটা যে, সেগুলিকে 'প্রতীকী ইচ্ছাপূরণ' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেমন, আমেদাবাদ বা লখনউ-এর মতো সুবিশাল শহরের মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০০ কোটি টাকা। এ দিয়ে জমি পরিমাপের (সার্ভে) কাজটুকুও সম্পন্ন করা যাবে কি না সন্দেহ। আবার, গ্রামীণ পরিকাঠামোয় 'কৃষি-জমি পরীক্ষা'য় (সয়েল টেস্ট) বরাদ্দ মোট টাকায়, দেশের প্রতি কৃষক পরিবারের সমস্ত চাষযোগ্য জমি পরীক্ষায় তার গড় প্রাপ্য ৬ টাকা! আরও একটি অসংগতি নজর কাড়ে। বিগত বছরগুলিতে চালু থাকা প্রকল্পগুলিতে এবারেরও 'সবুজ সংকেত' ও নতুন প্রকল্প মিলিয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে অনেক বেশি প্রকল্পই ঘোষিত হয়েছে এবারের বাজেটেও। কিন্তু, বেশ কিছু পুরোনো প্রকল্পে বর্তমান বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কমানো হয়েছে আগের তুলনায়। গত বছরে, পানীয় জল ও শৌচব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬,৬৬০ কোটি টাকা, এবারের বরাদ্দ পানীয় জলের জন্য ৩৬০০ কোটি টাকা। গরিব গ্রামবাসীদের বাড়ি তৈরির বরাদ্দ আগের তুলনায় অর্ধেক কমিয়ে করা হয়েছে ৮০০০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় গত বারের বরাদ্দ ২১,৭০০ কোটি টাকা, এবারের বরাদ্দ ১৪,৩৮৯ কোটি টাকা। এইভাবে, সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে গত বছরের তুলনায় মোট বরাদ্দ কমেছে ৯২,৩৯৮ কোটি টাকা।

চতুর্থত, অন্য কিছু ক্ষেত্রে আশঙ্কার 'সিঁদুরে মেঘ' এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া—সুদীর্ঘ ১৬২০ কিলোমিটার জলপথ ধরে যে গঙ্গা সংস্কার ও জল পরিবহণের প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে, সেটি নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিবেশবিদ ও অন্যান্য মহলেও বিভিন্ন আপত্তি ও বিতর্ক উঠেছে। এই দীর্ঘ নদীপথের সংস্কার রূপায়ণ শুরু হলে কোথায় কী প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা মাথাচাড়া দেবে—সেই প্রশ্ন ও আশঙ্কা প্রতি পদে পদেই থেকে যায়। এরকম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঘোষণার আগে যথেষ্ট সময় ধরে সচেতনতা কর্মসূচি ও অনুকূল জনমত গঠনের প্রয়োজন ছিল, যে প্রাক্-প্রস্তুতি সেভাবে আদৌ করা হয়নি।

পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল আশা জাগানো বিভিন্ন প্রস্তাব ঘোষণার পরেও কিন্তু এইভাবে অনেক সীমাবদ্ধতা, অসংগতি ও অনিশ্চয়তা মিশে রয়েছে—বাস্তব রূপায়ণ ও লক্ষ্যপূরণের প্রশ্নে। আসলে, এবারের বাজেট ঘোষণাতেও ছিল যথেষ্ট ও যথেচ্ছ আবেগময় আশাবাদ এবং সদিচ্ছার উচ্চারণ, কিন্তু প্রকৃত হিসেব-নিকেশের পরে দেখা যাচ্ছে কিছু বিভ্রান্তি ও গরমিল। কিন্তু, এটাও তো মানতেই হয়, কী শিল্পমহল, কী অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞমহল, এমনকী মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত সাধারণ মানুষদের সিংহভাগই এবারের বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

রাজকোষ ঘাটতি
অভিমুখ এবং তাৎপর্য

ঋণ বাদে সরকারের যে মোট আয় তার তুলনায় মোট ব্যয় বেশি হলেই দেখা দেয় রাজকোষ ঘাটতি। এই ঘাটতি যে কোনও সরকারের কাছেই একটা বড় চিন্তার কারণ। রাজকোষ ঘাটতি বাড়লেই সরকারের ওপর ঋণের বোঝা বাড়বে। উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের ভাটা পড়বে। এমনকী বাজার থেকে নেওয়া ঋণের ফলে সুদের হার বাড়লে বেসরকারি বিনিয়োগও মার খাবে। তাই রাজকোষ ঘাটতিকে একটি কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে বেঁধে রাখাই যেকোনও সরকারের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কীভাবে হবে এই কঠিন কাজ? রাজকোষ ঘাটতিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে আর্থিক সংহতিসাধনের পথে এগোতে ২০০৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে এফআরবিএম আইন। কিন্তু তার পরে বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কাকে এড়ানো যায়নি। রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষায় নতুন সরকার এবার কী করবে? কেলকর কমিটির সুপারিশ বা ব্যয় সংস্কার কমিশন এই কাজে নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারবে কি? লিখছেন **ড. অমিয়কুমার মহাপাত্র।**

কেন্দ্রীয় বাজেট নিছকই সরকারের আয়-ব্যয়ের একটা আর্থিক বিবরণ নয় বরং তা দেশের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। এদেশে আর্থিক বিকাশহার, তথা সকলকে শামিল করে উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া তার গতি—এসব কিছুই বাজেটের প্রেক্ষাপট, তার ধরন এবং লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে। সেইসঙ্গে, সামগ্রিকভাবে ক্ষেত্রীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের মাপকাঠিতেই বাজেটের প্রভাব এবং তাৎপর্য মূল্যায়ন করা হয়। দারিদ্র ও অসাম্য দূর করা, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্বের হার কমানো, মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দ্রুত আর্থিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করাই বাজেটের মূল লক্ষ্য।

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে এদেশে রাজকোষ নীতিও আর্থিক নীতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর্থিক শৃঙ্খলা, আর্থিক সংহতিসাধন, সর্বোপরি রাজকোষ ঘাটতির হার একটা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার মধ্যে বেঁধে রাখার ওপরই দেশের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই রাজকোষ ঘাটতি বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং ভারতীয় অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব ও তাৎপর্য কী তা বোঝাটা খুব জরুরি।

রাজকোষ ঘাটতি এবং তার তাৎপর্য

ঋণ ব্যতীত সরকারের যে মোট আয় তার তুলনায় সরকারের মোট ব্যয় বেশি হলে সেই পরিস্থিতিকেই রাজকোষ ঘাটতি বলে। এর মধ্যে 'ঋণ ব্যতীত' এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আয়ের খাতে ঋণ বাবদ যে আয় হয় তাকে বাদ দিয়েই এই রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কোনও একটি বিশেষ আর্থিক বছরে ঘাটতি পূরণের জন্য দেশকে মোট ঋণের ওপর কতটা নির্ভর করতে হয় তা এর থেকে জানা যায়। রাজকোষ ঘাটতির প্রধান দুটি অংশ হল রাজস্ব ঘাটতি এবং মূলধনি ব্যয়। রাজকোষ ঘাটতির মাত্রা কতটা হচ্ছে তার ওপরে নির্ভর করে ঋণের বিষয়ে সরকারের সামগ্রিক অবস্থান। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ জোগানের জন্য ঋণের ওপর কতটা নির্ভর করতে হবে তা রাজকোষ ঘাটতির মাত্রা দেখেই স্থির করা হয়।

একটি দেশের আর্থিক বিকাশ ও ঋণের দায় পরিমাপ করা হয় রাজকোষ ঘাটতির হার থেকে। সর্বোপরি একটি দেশের আর্থিক বুনিয়াদ কতটা মজবুত বা সে দেশের জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কতটা হবে রাজকোষ ঘাটতি মাত্রা তাও নির্ধারণ করে দেয়। রাজকোষ ঘাটতির মাত্রার ওপর একটি অর্থনীতির বিকাশ প্রক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। কখনও তা কার্যকর রূপ নিয়ে বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে; আবার কখনও তা প্রতিবন্ধক হয়ে বিকাশ প্রক্রিয়ার গতিরোধ করে।

সাধারণ তাৎপর্য

- একটি আর্থিক বছরে কোনও দেশের মোট কতখানি ঋণের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ হয় রাজকোষ ঘাটতি দেখে।
- ঋণের পরিমাণ বাড়লে সুদ ও সেই সঙ্গে মূল অর্থ পরিশোধের বোঝা বাড়ে সরকারের ওপর। ফলে সব মিলে একটি দেশের ভবিষ্যতের আর্থিক দায়ও বেড়ে যায়।
- বিপুল রাজকোষ ঘাটতি হলে ঋণের সুদ পরিশোধের জন্যও পুনরায় ঋণ নিতে সরকার বাধ্য হয়। এর ফলে সরকার এক ঋণের ফাঁদ এবং দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়তে পারে।
- বৈদেশিক ঋণ নিয়ে রাজকোষ ঘাটতি পূরণ করা হলে এক ধরনের রাজনৈতিক নির্ভরতা তৈরি হয় এবং এর ফলে দেশের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবাঞ্ছিত বহির্দেশীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
- রাজস্ব ব্যয়ের খাত থেকেই সুদ পরিশোধ করা হয়। তাই এই সুদের বোঝা যদি বাড়ে তাহলে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হবে। বিকাশ প্রক্রিয়া জোগানের জন্য সরকারের হাতে অর্থের টান পড়বে।
- বাজার থেকে বিপুল ঋণ নেওয়া হলে সুদের হার বাড়বে। এতে বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যয় বেড়ে যাবে। ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলি বিনিয়োগের উৎসাহ হারাবে। তাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র

সংকুচিত হয়ে যাবে যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় 'ক্রাউডিং আউট' এফেক্ট।

বিশেষ তাৎপর্য

বিশ্বব্যাপী মন্দা, চলতি খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি, মোট সঞ্চয় হ্রাস এবং ভোগের নিম্নমুখী গ্রাফ ইত্যাদির মতো বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) বিকাশহার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। এই পরিস্থিতির কারণেই দেশের নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনা রচয়িতারা প্রসারণমূলক রাজকোষ নীতি গ্রহণ করে সেই পথে চলতে বাধ্য হয়েছেন।

অর্থাৎ সরকারি ব্যয় বা বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে চেয়েছেন। দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ও মজবুত করতেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। কিন্তু আখেরে এতে রাজকোষ ঘাটতির হার লাগামছাড়া হয়েছে যার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে দেশের অর্থনীতিকে। তাই ফিসক্যাল কনসোলিডেশন বা আর্থিক সংহতিসাধনের জন্য সরকার প্রতি বছর রাজকোষ ঘাটতি ০.৬ শতাংশ হারে কমিয়ে ২০১৬-১৭ সালে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের শেষে এই রাজকোষ ঘাটতির হার জিডিপি-র ৩ শতাংশে নিয়ে আসায় এক সাহসী লক্ষ্য স্থির করেছে। এই লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই আর্থিক সংহতি সাধনের প্রক্রিয়া জোরদার করতে ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে সরকার রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ৪.১ শতাংশে বেঁধে রেখেছে।

যাইহোক বছরের পর বছর ধরে ক্রমবর্ধমান রাজকোষ ঘাটতি এবং তার ফলে উদ্ভূত প্রভাবের কথা মাথায় রেখে সরকারের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সমন্বয়সাধন, এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির জন্য ভারত সরকার একটি নতুন আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছে। আর্থিক সংহতিসাধন, বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক বিষয় পরিচালনা এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার এফআরবিএমএ (আর্থিক-দায়িত্ব এবং বাজেট পরিচালনা আইন ২০০৩) প্রণয়ন করেছে। তার ফলে সাম্প্রতিক কালে 'রাজকোষ ঘাটতি'—খুব বাজার চলতি শব্দ হয়ে গেছে এবং এর মাত্রা বা প্রভাব নিয়ে দেশের জনসাধারণও ভাবতে শুরু করেছে।

রাজকোষ ঘাটতি : তথ্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ

এখানে গত এক দশকের (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫) রাজকোষ ঘাটতির হিসেব বিশ্লেষণ করে এর ওপর ঠিক আগের সময়কালের প্রভাব নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্তমানের চাহিদা ও অবস্থাও বোঝার চেষ্টা হবে। নীচে প্রদত্ত সারণিতে ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত রাজকোষ ঘাটতির হিসেব দেওয়া হল। বোঝার সুবিধার জন্য এফআরবিএম আইন চালু হওয়ার পরবর্তী সময়ের তথ্যই বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০০৮-০৯ সালের মধ্যে প্রাক্কলিত রাজকোষ ঘাটতির অঙ্ক অনেক কমেছে এবং তা ৪.৪ শতাংশ, ৪.৩ শতাংশ, ৩.৮ শতাংশ এবং ২.৫ শতাংশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে। আর্থিক সংহতিসাধন নীতি রূপায়ণের ওপর জোর দেওয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। এফআরবিএম আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী রাজকোষ ঘাটতিকে জিডিপি-র ১.৫ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্য নেওয়ার দরুন ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত দেশের রাজকোষের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মন্দার মোকাবিলা এবং জিডিপি-র বিকাশ হার ঊর্ধ্বমুখী করার তাগিদে আর্থিক উৎসাহদান প্যাকেজে (ফিসক্যাল স্টিমুলাস প্যাকেজ) অর্থ জোগাতে গিয়ে ২০০৯-১০ সালে রাজকোষ ঘাটতি লাফিয়ে জিডিপি-র ৬.৮ শতাংশে পৌঁছে যায়।

কিন্তু ২০০৯-১০ সালের পরবর্তী সময়ে ২০১০-১১ সালে প্রাক্কলিত রাজকোষ ঘাটতির হার ৫.৫ শতাংশ এবং ২০১১-১২ সালে তা আরও কমে ৪.৬ শতাংশে চলে আসে। এটা সম্ভব হয়েছে এফআরবিএম আইন রূপায়ণের জন্যই যে আইন সরকারকে রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রেখে আর্থিক সংহতি সাধনের পথে চলতে বাধ্য করেছে। সম্ভবত ইউরো সংকট এবং অর্থনীতিতে একনাগাড়ে চলা মন্দার ফলে ২০১২-১৩ সালে রাজকোষ ঘাটতি সামান্য বেড়ে হয়েছে ৫.১ শতাংশ, আবার ২০১৩-১৪ সালেই তা কমে ৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাজেটে (২০১৪-১৫) দেশের অর্থমন্ত্রী কেলকর কমিটির প্রস্তাব মেনে রাজকোষ ঘাটতির হার কঠোরভাবে জিডিপি-র ৪.১ শতাংশে বেঁধে রেখেছেন। ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে রাজকোষ ঘাটতির হার যাতে কোনওমতেই জিডিপি-র ৩ শতাংশের বেশি না হয় তা নিশ্চিত করতে সরকার যে যথেষ্ট যত্নবান তার প্রমাণ এই বাজেট।

২০০৩ সালে এফআরবিএম আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রকৃত এবং প্রাক্কলিত রাজকোষ ঘাটতির তথ্য দেওয়া হল সারণি-২ তে। শতাংশের হিসাবের সবচেয়ে বড় পার্থক্য ঘটেছে ২০০৮-০৯ সালে। ওই সময় এফআরবিএম আইনের যে যথাযথ প্রয়োগ হয়নি তার প্রমাণ দিতে এই তথ্যটাই যথেষ্ট যে ওই বছর প্রকৃত ঘাটতি জিডিপি-র ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিচ্যুতি বা পার্থক্য বিশ্লেষণ— প্রাক্কলিত বনাম প্রকৃত

যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল বাস্তবে তা অর্জন করা গেছে কিনা সেটা বিশ্লেষণের

সারণি-১
প্রাক্কলিত রাজকোষ ঘাটতি (জিডিপি-র শতাংশের হিসেবে)

বছর	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রাক্কলিত রাজকোষ ঘাটতি (জিডিপি-র শতাংশের হিসেবে)	৪.৪	৪.৩	৩.৮	৩.৩	২.৫	৬.৪	৫.৫	৪.৬	৫.১	৪.৮	৪.১

সূত্র : ভারতের বাজেট নথি থেকে লেখক সংগ্রহ করেছেন।

সুবিধার জন্য সারণি-২-তে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে প্রকৃত ও প্রাক্‌কলিত রাজকোষ ঘাটতির মধ্যে কতটা পার্থক্য বা বিচ্যুতি হয়েছে তা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। এই পার্থক্যের মধ্যে সরকারের নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে এই পার্থক্য বা বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থেকেছে এবং তা ০.২ থেকে ০.৬ অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু ২০০৮-০৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা ও আর্থিক অনিশ্চয়তার আবহে দেশের মন্দার পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার আর্থিক উৎসাহদান প্যাকেজ গ্রহণ করে। আর, তার ফলে প্রাক্‌কলিত রাজকোষ ঘাটতির হার ২.৫ শতাংশ থাকলেও প্রকৃত ঘাটতি ৬ শতাংশে পৌঁছে যায়। পরবর্তী সময়ে এই পার্থক্য ০.৪ থেকে ১.১-এর মধ্যেই থেকেছে। অর্থাৎ এদেশে বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজকোষ পরিচালনা ও আর্থিক দায়িত্বের নীতি মেনে চলা হচ্ছে এই তথ্য তারই প্রমাণ।

মোট প্রকৃত হিসাবের ওপর গুরুত্ব

শুধুমাত্র শতাংশের হিসাবেই রাজকোষ ঘাটতিকে বিচার করলে চলবে না। প্রকৃত সংখ্যা বা পরম মানের (অ্যাবসোলিউট টার্ম) ভিত্তিতে রাজকোষ ঘাটতিকে বিচার না করা হলে প্রকৃত পার্থক্যগুলি কখনওই বোঝা বা মূল্যায়ন করা যাবে না। এই কারণেই দেশের ওপর কতটা আর্থিক দায় বা ঋণ বোঝা চাপছে তা জানার জন্য আমাদের প্রকৃত সংখ্যা বা পরম মানগুলিকে (অ্যাবসোলিউট ফিগার) বিশ্লেষণ করা উচিত।

প্রকৃত অঙ্কে ১,২৫,২০২ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ২০০৪-০৫ সালে কিন্তু তারপর ২০০৬-০৭ পর্যন্ত আর্থিক বছরগুলিতে এই অঙ্কে মাঝারি বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কঠোরভাবে এফআরবি আইনের রূপায়ণের দরুন ২০০৭-০৮ সালে প্রকৃত ব্যয়ের অঙ্কটা ১,২৬,৯১২ কোটি টাকায় নেমে আসে। আবার ২০০৮-০৯ সালে প্রকৃত ব্যয়ের অঙ্ক ১,২৬,৯১২ কোটি টাকা (২০০৭-০৮) থেকে এক লাফে বেড়ে ৩,৩৬,৯৯২ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছয়, যেখানে প্রাক্‌কলিত বাজেটে হিসাব ছিল ১,৩৩,২৮৭ কোটি টাকার। এর ফলে ওই বছর প্রকৃত রাজকোষ ঘাটতি ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮-এর মধ্যে যেকোনও আর্থিক বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ছিল।

আমরা যদি প্রাক্‌কলিত বাজেট হিসাবের দিকে চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাব ২০১০-১১ সালে রাজকোষ ঘাটতির অঙ্কটা ছিল ৩,৮১,৪০৮ কোটি টাকা যা ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের তুলনায় সামান্য কম। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের মধ্যে প্রকৃত রাজকোষ ঘাটতি লাফিয়ে লাফিয়ে ৪,০০,৯৯৬ কোটি টাকা থেকে ৫,৩১,১৭৭ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। শতাংশের হিসাবে রাজকোষ ঘাটতি কমলেও প্রকৃত অঙ্ক বা চরম মানের বিচারে সরকারের ঋণ কয়েক গুণ। তাই দক্ষভাবে আয়-ব্যয় পরিচালনার মাধ্যমে সরকার যদি শতাংশের হিসাবের পাশাপাশি চরম মানের বিচারে রাজকোষ ঘাটতির রাশ টান করে একমাত্র তাহলেই সেটা আর্থিক বিচক্ষণতার পরিচয় হবে।

সারণি-২
রাজকোষ ঘাটতির পার্থক্য

বছর	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রাক্‌কলিত রাজকোষ ঘাটতি (শতাংশে)	৪.৪	৪.৩	৩.৮	৩.৩	২.৫	৬.৮	৫.৫	৪.৬	৫.১	৪.৮	৪.১
প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি (শতাংশে)	৪	৪.১	৩.৫	২.৭	৬.০	৬.৪	৪.৯	৫.৭	৪.৮	পাওয়া যায়নি	—
রাজকোষ ঘাটতির পার্থক্য	০.৪	০.২	০.৩	০.৬	—৩.৫	০.৪	০.৬	—১.১	০.৩	—	—

সূত্র : ভারতের বাজেট নথি থেকে লেখক সংগ্রহ করেছেন।

সারণি-৩
ভারতে রাজকোষ ঘাটতি বৃদ্ধি
ভারতে রাজকোষ ঘাটতি বৃদ্ধি : এফআরবিএম আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী সময়কালের বিশ্লেষণ
(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

বছর	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রাক্‌কলিত রাজকোষ ঘাটতি	১৩৭৪০৭	১৫১১৪৪	১৪৮৬৮৬	১৫০৯৪৮	১৩৩২৮৭	৪৪০৯৯৬	৩৮১৪০৮	৪১২৮১৭	৫১৩৫৯০	৫৪২৪৯৯	৫৩১১৭৭
প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি	১১৫২০২	১৪৬৪৩৫	১৪২৫৭৩	১২৬৯১২	৩৩৬৯৯২	৪১৮৪৮২	৩৭৩৫৯১	৫১৫৯৯০	৪৯০১৯০	পাওয়া যায়নি	—

সূত্র : ভারতের বাজেট নথি থেকে লেখক সংগ্রহ করেছেন।

সরকারের প্রকৃত ব্যয় এবং প্রাক্‌কলিত প্রকৃত ব্যয়ের (এস্টিমেটেড অ্যাবসোলিউট এক্সপেন্ডিচার) মধ্যে যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে সরকারের ব্যয় বেড়েছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ২০১০-১১ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বছর। ওই দুই বছরে প্রকৃত মোট ব্যয় সামান্য কমেছে।

সরকারি উদ্যোগ

রাজকোষ ঘাটতিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বেঁধে রাখতে গেলে কতকগুলি বিষয়কে বিবেচনার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে যেগুলির একটা নিজস্ব ইতিবাচক এবং নির্ণায়ক প্রভাব রয়েছে। আশানুরূপ ফলাফল পেতে গেলে রাজকোষ ঘাটতিকে শুধুমাত্র শতাংশের হিসাবেই বেঁধে রাখলে চলবে না, বরং প্রকৃত অঙ্কের বিচারেও এই ঘাটতি কমাতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণ, তেজি কর ব্যবস্থা, কর আদায় বাড়ানো, উন্নততর কর প্রশাসন, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি এবং দক্ষ ব্যয় পরিচালনার মাধ্যমেই রাজকোষ ঘাটতিকে একটা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়, অর্থাৎ এফআরবিএম আইনের প্রস্তাব মতো ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে এই হার জিডিপি-র ৩ শতাংশে বেঁধে রাখা যাবে। উন্নত সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশ, সর্বোচ্চ ও সুপ্রশাসন এবং সর্বোপরি জনসাধারণের অংশগ্রহণ আর্থিক সংহতি সাধনের পথে অত্যন্ত জরুরি। রাজকোষ ঘাটতিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় বেঁধে রাখার জন্য সামগ্রিকভাবে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যেমন—

১. যুক্তিসংগত ভাবে ব্যয়

প্রকৃতভাবে ব্যয় কমানো মোটেই কোনও সহজ কাজ নয়। কারণ সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিতে হয়। খাদ্যপণ্য, সার বা পেট্রোপণ্যে যে বিপুল ভর্তুকি দেওয়া হয় তাতে কাটছাঁট করা প্রয়োজন। এছাড়াও, ব্যয় তথা এবং বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দকে যুক্তিসংগত করতে সরকার 'ব্যয় সংস্কার কমিশন' গঠন করেছে। বিভিন্ন খাতে আরও সুদক্ষ ও যুক্তিসংগতভাবে ব্যয়বরাদ্দ করা এবং সেইসঙ্গে অর্থের অপব্যবহার রোধ ও পুরো প্রক্রিয়ার ফাঁক-ফোকরগুলিকে বন্ধ করার প্রয়াসেই এই কমিশন গঠন। সেইসঙ্গে সরকারি ভরতুকি ও অন্যান্য ব্যয়ের সুবিধা যাতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যেসব তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলা, দরিদ্র ও বঞ্চিত অংশের কাছেই পৌঁছয় তা নিশ্চিত করাও এই কমিশন গঠনের অন্যতম লক্ষ্য। সীমিত সহায়সম্পদের মধ্যেও সরকারি ব্যয়ে আরও কার্যকারিতা আনা যেতে পারে। এরজন্য সহায় সম্পদের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, অথবা জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের সঙ্গে আপস না করেও ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ধরন ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে একটু অদলবদল করে নিতে হবে।

২. বিলগ্নীকরণ

ঘাটতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলির বিলগ্নীকরণ এক কথায় অভাবে পড়ে পরিবারের মূল্যবান সামগ্রী বিক্রিরই শামিল। আর এই বিলগ্নীকরণের বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতরও বটে, কারণ এতে জনকল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বিলগ্নীকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যদি 'রাষ্ট্রায়ত্ত' চরিত্রটাই হারিয়ে ফেলে তবে সেটা সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় একটা বড় ধাক্কা হবে। তবে লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রুগ্‌ণ ইউনিট পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন আছে। এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় যে রাজস্ব আয় হবে তা দিয়ে ঘাটতি মোকাবিলার পাশাপাশি রাজস্ব ঘাটতিও কমানো যাবে।

৩. কর ও কর-বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি

কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে আয় উৎস ও সেইসঙ্গে আয়ের অঙ্ক বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। রাজকোষ ঘাটতিকে ধারাবাহিকভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় বেঁধে রাখতে গেলে এই প্রচেষ্টা জারি রাখতেই হবে। তেজি কর ব্যবস্থা, কর আদায় বৃদ্ধি বা উন্নততর কর প্রশাসনের মাধ্যমে আগামী দিনে জিডিপি-র অনুপাতে কর-এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। এতে রাজকোষ ঘাটতি অনেক কমানো যাবে এবং এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এফআরবিএম আইনের প্রস্তাব মতো আর্থিক বিচক্ষণতাও প্রমাণ করা যাবে। কর-বহির্ভূত পথে রাজস্ব বাড়ানোর জন্য এর বিজ্ঞানসম্মত কর-বহির্ভূত আয়ের নীতি রচনা করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলির পরিচালনা আরও উন্নত করলে কর-বহির্ভূত খাতে রাজস্ব আদায় সবচেয়ে বাড়তে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক লোকসানের বোঝা কমানো সম্ভবপর হলে এই লক্ষ্যও পূরণ করা যাবে।

পরিশেষে

একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির চাহিদা, তথা জনসাধারণের চাহিদা ভালো করে বুঝে তবেই সরকারি বাজেটের রূপরেখা তৈরি করা উচিত। দেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনসাধারণই যদি দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সুফল না পায় তাহলে গণতন্ত্র তার মহিমা হারাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের এই অগ্রগতির তথা সমৃদ্ধির ছবিটা কিন্তু স্পষ্ট। তাই দেশের সমস্ত মানুষ বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নতিসাধনের কথা মাথায় রেখে সকলকে শামিল করে ধারাবাহিক বিকাশের মডেল অনুসরণ করে সরকারকে এমন বাজেট তৈরি করতে হবে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের একটা দিশা থাকে।❑

[ড. অমিয় কুমার মহাপাত্র নতুন দিল্লির এপিজে স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট-এ অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক]

তথ্যসূত্র :

- কেন্দ্রীয় বাজেট প্রতিবেদন ২০০২-০৩ থেকে ২০১৪-১৫
- ভারতের সিআইআই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০, ২০১১, ২০১২
- ভারত সরকারের সর্বশেষ আর্থিক সমীক্ষা
- সিএসআই-ই রিপোর্টস অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সংখ্যা
- সংবাদপত্র—বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ইকনমিক টাইমস এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া—বাজেট পরবর্তী বিশ্লেষণ

২০১৪-১৫-র সাধারণ বাজেটের বিনিয়োগমুখীনতা

২০১৪-১৫-র সাধারণ বাজেটের সামগ্রিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি এর বিনিয়োগমুখীনতা এবং নতুন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে **শশাঙ্ক ভিদে***-র এই নিবন্ধে। আর্থিক বিকাশে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, বাজেটে বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত নানা পদক্ষেপ, সেই পথে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের দিশাও ফুটে উঠেছে লেখার পরিসরে।*

২০১৪-১৫-র সাধারণ বাজেটের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন সরকারের সারা বছরের কর্মসূচির একটি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করে দেওয়া। এই কাঠামো নির্মাণের কাজটি এমন এক সময়ে করতে হচ্ছিল যখন দেশের বার্ষিক বিকাশহার পূর্বে অর্জিত ৭-৮ শতাংশের অনেক নীচে, শিল্পোৎপাদন কার্যত থমকে, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি প্রত্যাশার থেকে ঢের কম এবং মূলধনি বাজার নিরাশায় ডুবে। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার থেকে রেহাইয়ের সংকেত যখন সবেমাত্র মিলছিল, তখনই দুর্বল বর্ষা ও আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি নতুন করে আশঙ্কার ছায়া নিয়ে এল। বাজেটের প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা। অর্থনৈতিক বিকাশহার যখন সবেমাত্র ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে, তখন ঘাটতি বেড়ে চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বাজেটে প্রত্যক্ষ কর বিধিতে যে ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে আয় কমবে ২২২০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পরোক্ষ করের দরুন ৭৫২৫ কোটি টাকা আয় বাড়বে। অর্থাৎ ঘাটতি থেকে যাবে ১৪,৬৭৫ কোটি টাকা, যা করের ভিত্তি ও পরিধি প্রসারের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আর্থিক সংহতিসাধনের লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে আয় বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। আয় বৃদ্ধির জন্য আবার প্রয়োজন উন্নত বিকাশহার।

কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে মোট ১৭.৯ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলেছে, মাথাপিছু হিসাবে যা দাঁড়ায় ১৫ হাজার টাকায়। ২০১৪-১৫ সালের প্রস্তাবিত জিডিপি-র এটি ১৩.৯ শতাংশ। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির খরচ যোগ করলে মোট সরকারি ব্যয় জিডিপি-র ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। মাথাপিছু হিসাবে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ হাজার টাকা। আন্তর্জাতিক নিরিখে এগুলি খুব বেশি না হলেও বলার মতো। কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যয়ের মাত্র অর্ধেক কর বাবদ আয় থেকে উঠে আসে। তাই আয়ের অন্যান্য উৎস আবিষ্কার এবং সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা আরও বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। ২০০৮-এ বিশ্বজনীন আর্থিক সংকট শুরু হবার আগে জিডিপি-র সাপেক্ষে কর সংগ্রহের অনুপাত যা ছিল, বর্তমানে তা প্রায় ২ শতাংশ কমে গেছে। কৌশলগত দিক থেকে তাই বাজেট এমন হওয়া দরকার যাতে একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশহার পুনরুজ্জীবিত হবে, আবার অন্যদিকে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে ব্যয়ের জন্য সরকারের হাতে যথেষ্ট সম্পদ থাকবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের পেশ করা বাজেট, ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববর্তী সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটের সঙ্গে সার্বিক বিচারে খুব একটা আলাদা নয়। আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৪.১ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্য অপরিবর্তিত। আগামী দু বছরে এই ঘাটতি জিডিপি-র ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।

নতুন অগ্রাধিকারের সংকেত

এবারের বাজেটে শুধুমাত্র উপার্জন ও ব্যয়ের নানা পন্থা খোঁজার বদলে নীতিগত পরিবর্তন, নীতি পরিচালনার প্রকৃতি ও কর্মসূচির ওপর জোর দিয়ে একটি সার্বিক কৌশল প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, এ এক দীর্ঘ যাত্রার সূচনা। তিনি বলেছেন, বাজেটে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে, তা দিশা নির্দেশ করে মাত্র, অর্থাৎ সংখ্যাগতভাবে এখনও সেগুলি সুনির্দিষ্ট নয়। তাই স্বল্প ও দীর্ঘকালীন মেয়াদে বাজেটে কী কী লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে, সেটা জানা বিশেষ দরকার।

এই বাজেটে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের তুলনায় গত বছরের থেকে অনেক বেশি হারে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় এবং মূলধনি ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। বাজেটে বিনিয়োগজনিত ব্যয়কে উৎসাহ দেবার প্রয়াস রয়েছে। সুদ বাবদ ব্যয় বাড়লেও গত বছরের তুলনায় তার হার কম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভরতুকির সংস্থান গত বছরের সাপেক্ষে একই মাত্রায় রেখে তা আরও দক্ষতার সঙ্গে সঠিক উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধির হার গত বছরের মতোই ১২.৯ শতাংশ। বিলগ্নীকরণ বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের থেকে ৩৭৫০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ৫৩ হাজার কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত অনুমানের থেকে সামান্য কম। রাজকোষ ঘাটতিকে এই স্তরে বেঁধে রাখার লক্ষ্যে একদিকে যেমন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে

তেমনি বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে আরও বেশি উপার্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন

ভারতে রাজনৈতিক, বিচারবিভাগীয়, পরিচালনাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গিগত ভারসাম্য বজায় থাকে। আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য থাকলেও প্রায়শই অভিন্ন এমন এক কর্মসূচির উদ্ভব হয়, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক নীতিসমূহের রূপায়ণ ঘটে। এই কর্মসূচির বর্তমান বিষয় হল, উচ্চ বিকাশহার—যার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বাড়বে আয়।

বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা থাকলেও এর আরও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল, বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে এটি সক্ষম হয় কি না, তার বিচার। অর্থনৈতিক সাবধানতা, উন্নত কর ব্যবস্থাপনা, সুশাসনের অঙ্গীকার, দ্রুত ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কর সংস্কারের মতো যেসব সংস্থান এতে রয়েছে, তা কি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করতে পারবে? আগের তুলনায় ব্যবসার খরচ কমার বিষয়ে তাঁরা কি নিশ্চিত হবেন? বিদেশি পুঁজি এবং দেশীয় পুঁজি আকর্ষণে কি এই বাজেট সহায়ক হবে? পূর্বাপর কর বা Retrospective tax নিয়ে সরকার তার যে অবস্থান জানিয়েছে, তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গত কয়েক বছরে বিনিয়োগের হার ক্রমশ কমেছে। ২০০৭-০৮ সালে বিনিয়োগের হার ছিল ৩৮ শতাংশ; ২০১০-১১ সালে তা নেমে আয়ে ৩৬.৫ শতাংশে। এজন্য মূলত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটকেই দায়ী করা হয়। ২০১২-১৩ সালে এই হার আরও কমে ৩০ শতাংশে নামে, এর কারণ হিসাবে আঙুল তোলা হয় তথাকথিত 'নীতি পঙ্গুতা'-র দিকে, যদিও কোনও মাপকাঠিতে তা মাপা কঠিন। তবে শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বেই এই সময়ে বিনিয়োগ ও বিকাশের হারে মন্থরতা দেখা যায়।

নতুন সরকারের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা হল, সুশাসনের পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সরকার ব্যবসায়িক পরিস্থিতির জটিলতা কমিয়ে আনবে এবং সরকারি লেনদেন সহজতর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থায় সরাসরি কোনও পরিবর্তন আনতে পারে না। তবে, কেন্দ্রে সুশাসনের প্রবর্তন হলে রাজ্যগুলিতেও তার পরোক্ষ প্রভাব পড়বে।

পরোক্ষ করের আওতায় পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে আইন প্রণয়ন করা হবে বলে সরকার ইতিমধ্যেই আশ্বাস দিয়েছে। এই কাজটি হলে ব্যবসায়িক লেনদেনের জটিলতা কমবে, যা বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির আর একটি ক্ষেত্র হল প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে সরকারের অবস্থান। এই অবস্থান বিদেশ থেকে আরও বেশি লগ্নিকারীদের আকর্ষণ করবে কি না এবং তার প্রভাবে দেশীয় বাজারে আরও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। আবার শহরে রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে, যেখানে প্রকল্পের আকার অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদিত, সেখানে এর ঊর্ধ্বসীমা কমানো হয়েছে। উৎপাদন সংস্থাগুলির বাজার সংক্রান্ত কাজকর্মের ওপর বিধিনিষেধ সহজতর করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এমন নানা প্রশাসনিক ও নীতিগত পদক্ষেপের ঘোষণা এবারের বাজেটে রয়েছে, যা ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে দক্ষতর ও মসৃণতর করে তুলতে সহায়ক হবে বলে বিনিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হতে পারেন। বাজেটে মধ্যমেয়াদি কৌশলের মূল লক্ষ্যগুলি হল—উচ্চ বিকাশ, আর্থিক ভারসাম্য এবং যাঁদের জন্য ভরতুকি ও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, পরিষেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে নির্ভুলভাবে তাঁদের কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। নীতিগত এই অবস্থান ইতিবাচক হলেও, বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশকে কার্যকর বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে হলে সরকারকে লগ্নি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি নিতে হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ

উচ্চ বিকাশের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। এজন্য বেসরকারির ক্ষেত্রে ওপর নির্ভর করতেই হবে। সরকারি ক্ষেত্রকেও উদ্যোগী হতে হবে বাজার থেকে সম্পদ সংগ্রহে। বাজেটে বেসরকারি সঞ্চয়কেও উৎসাহ দেওয়া দরকার। আয়করে কিছু ছাড় দিয়ে অর্থমন্ত্রী সেই চেষ্টাই করেছেন। কিষাণ বিকাশ পত্রকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রকে বিনিয়োগে উদ্যোগী হওয়ার সংকেত দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ সরকারি ও পরোক্ষ কিছু উৎসাহদানের সংস্থানও রয়েছে বাজেটে; বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, কর সংক্রান্ত কিছু পদক্ষেপ, সীমাশুল্কের সংশোধন প্রভৃতি এর নিদর্শন। পরিকাঠামো, নগরোন্নয়ন এবং জলসম্পদ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে।

বাজেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে পরোক্ষ উৎসাহের সংস্থান রয়েছে, তা বিনিয়োগ জনিত খরচ কমাতে সাহায্য করবে। গৃহঋণের ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের কর ছাড়ের ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লগ্নিকারীদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএলআর ও সিআরআর সংক্রান্ত ব্যয় মকুব প্রভৃতি এর উদাহরণ।

বাজেট বক্তৃতায় কৃষি, উৎপাদন শিল্প, নগরোন্নয়ন, পরিকাঠামো ও জলসম্পদ ক্ষেত্রে ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

একশোটি স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার ঘোষণা শহুরে ভারতের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ। নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সমন্বয়সাধন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ। অর্থের সংস্থান তো বটেই, নাগরিক পরিষেবা প্রদানের যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবেও এই কাজ ব্যাহত হয়। নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাহিদার দিকেই নয়, খেয়াল রাখতে হবে সর্বস্তরের মানুষের অভাব পূরণের প্রতি। যে স্মার্ট

সিটিগুলি গড়ে তোলার কথা হচ্ছে, সেখানে অবশ্যই নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির আবাসন ও জীবনযাত্রাজনিত সমস্যার সমাধানে জোর দিতে হবে। সকলে যাতে মাথার ওপর ছাদের সংস্থান করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা উন্নয়নের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য শর্ত। নতুন শহর গড়ে তোলার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিতে হবে পুরোনো শহরগুলির পুনরুজ্জীবনেও। তাহলে বর্তমানে যে সুবিধা এই শহরগুলি ভোগ করে, তাও হাতছাড়া হবে না।

এটাও বোঝা দরকার যে, বাণিজ্যিক সফলতার সম্ভাবনা ছাড়া নগরোন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ ও নগরোন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে ভারতের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশ, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত দিক থেকে সুস্থিত হয়ে ওঠে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প করিডর প্রভৃতি গঠনের জন্য শিল্পক্ষেত্র ও নগরোন্নয়নের মধ্যে সমন্বয়ের সঙ্গে প্রয়োজন নাগরিক পরিষেবা প্রদানের সুদক্ষ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এক বছর আগে প্রস্তাবিত উৎসাহদান প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে। শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যও রয়েছে বিশেষ উৎসাহের ব্যবস্থা।

পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি মডেলের প্রয়োজনীয়তার ওপর বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গত এক দশকের অভিজ্ঞতা বিশেষ সহায়ক হবে।

নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এই পদক্ষেপগুলি কি যথেষ্ট? আসল উত্তর কিন্তু লুকিয়ে আছে শাসনের গুণমানে।

বিনিয়োগের নিয়মিত প্রবাহের পথে বাধা

গত কয়েকবারের বাজেটেও কৃষি ও পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সর্বাত্মক উন্নয়ন, দারিদ্র দূর, খাদ্য সুরক্ষা, কৃষকদের ন্যায়সংগত উপার্জন, উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশের মতো লক্ষ্যগুলি সব বাজেটেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাম্প্রতিককালে জিডিপি-র সাপেক্ষে উৎপাদন ক্ষেত্রের অবদান ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা এবং দশ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ আকর্ষণের মূল মন্ত্র হিসাবে পরিকাঠামো উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকৃত ফলাফল কিন্তু প্রত্যাশার অনেক নীচে। কার্য সম্পাদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র, দুর্নীতির মতো বিষয়গুলি। এর সমাধানে রাজনৈতিক সহমত গড়ে তোলা, একান্ত আবশ্যক।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উচ্চ বিকাশের আদর্শ পরিস্থিতি, মধ্য হারের বিকাশ অথবা মধ্যমেয়াদি বার্ষিক বিকাশহার মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি। বিভিন্ন অসাম্য দূর করে বিনিয়োগ আকর্ষণে দক্ষতার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন, এবারের বাজেটে এই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রাজনৈতিক স্তরে মধ্যস্থতার প্রয়াস চালানো যেতে পারে। সাধারণত অসাম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মধ্যস্থতা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু পরিবেশগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে দেয় প্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতা।

যত দিন যাবে, জমি-জল-দূষণমুক্ত বাতাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদগুলির চাহিদা ততই বাড়বে। কেবল দামের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক এই চাহিদার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না। এরমধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তাই সমাধানের প্রক্রিয়া হতে হবে দ্রুত ও দক্ষ।

নতুন বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে হলে আগে প্রয়োজন সরকারি ব্যয়ের পরিধি বাড়ানো। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বদল ঘটিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্পদকে অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া উচিত।

মূলত বেসরকারি বিনিয়োগ নির্ভর, সুস্থিত, উচ্চহারসম্পন্ন যে বিকাশের লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত নীতিসমূহের কার্যকর রূপায়ণ আর এজন্য সবথেকে বেশি দরকার সুষম সংসদীয় ও প্রশাসনিক উদ্যোগ।❑

[ড. শশাঙ্ক ভিড়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনোমিক রিসার্চ, নতুন দিল্লিতে সিনিয়র রিসার্চ কাউন্সেলর। ড. ভিড়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন এবং বেশ কিছু বইও লিখেছেন।]

WBCS MAINS -2014

এবার শুরু বাছাই পর্ব

Success Record in WBCS-2011 & Misc.-2011	
Groups	Academicians
Gr.-A	27
Gr.-B	08
Gr.-C	94
Gr.-D	06
Misc.	50
Total	185

Our Success in WBCS Exam.

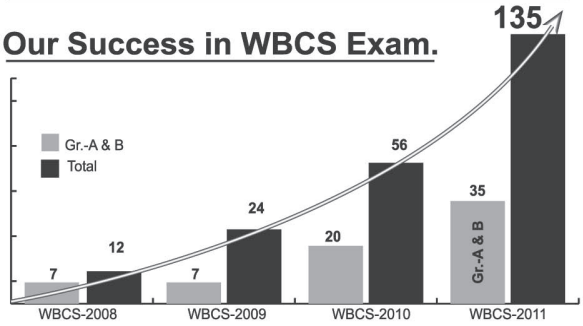

এবার থেকেই শুরু হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মেনস পরীক্ষা। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফরম্যাটই বদল হয়নি, বদল হয়েছে বিষয় বিন্যাসেও। সংযোজিত হয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন বিষয়। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি। MCQ এবং কনভেনশনাল দুটি বিপরীত ধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতিও এবার মেনসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ৮০০ নম্বরের MCQ এবং ৮০০ নম্বরের কনভেনশনাল লিখিত পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবার থেকে। শতকরা হারের নিরিখে হ্রাস পেয়েছে ইন্টারভিউয়ের গুরুত্ব। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ মার্কসের হার ১৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১১ শতাংশ। 'সি' গ্রুপের ক্ষেত্রে মোট নম্বরের সাপেক্ষে ইন্টারভিউয়ের মার্কসের হার আগে ছিল ২২ শতাংশ, এখন সেটা কমে হয়েছে ১১ শতাংশ। 'ডি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ঐ হার ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ। তুল্যমূল্য বিচারে এবার থেকে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মেনসই শেষ কথা বলবে। নিজের চাকরিকে ৯০ শতাংশ সুনিশ্চিত করে নিতে এখনই শুরু করা চাই মেনসের প্রস্তুতি। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্য **'Inclusive Mains Batch'** শুরু হচ্ছে আগস্টের মাঝামাঝি। ক্লাশরুম গাইডেন্সের সাথে সাথে পাওয়া যাবে প্রতিটি বিষয়ের ওপর ১০০ শতাংশ কমনযোগ্য ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত ব্রান্ড নিউ স্টাডি ম্যাট। সঙ্গে **থাকছে ১০৫ টিরও বেশি মকটেস্ট,** যা আপনার পারফরমেন্সকে আরও শানিত ও ক্ষুরধার এবং নিখুঁত করে তুলবে।

পোস্টাল কোর্সেরও বন্দোবস্ত আছে

WBCS-2012 ?? আপনার লক্ষ্য কি Gr.-B ?? Personality Test

বি গ্রুপে ডাক পায় কারা—এ প্রশ্ন সকলের মনে। গ্রুপ-বি কে এক নম্বরে দিলে ডাক পাওয়ার পিছনে না হয় যুক্তি আছে। কিন্তু দশ নম্বরে কিংবা চার-পাঁচ-ছয়ে দিয়ে ডাক পাওয়ার পিছনে যুক্তি কি? কারণ বা নিয়ম যাই হোক না কেন, এই সুযোগকে হেলায় হারালে চলবে না।

মনে রাখতে হবে, গ্রুপ-বি এর ইন্টারভিউ আর তিনটি গ্রুপ হতে একেবারেই আলাদা। গ্রুপ-বি সার্ভিসে মানসিক গুণাবলীর সাথে সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র জিমে গড়া অ্যাথলিট সুলভ চেহারা দিয়ে গ্রুপ-বি এর বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। বি-তে সাফল্যের চাবি হল Body with Brain। মানসিক দৃঢ়তা, অত্যধিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, দীর্ঘ সময় ধরে একনাগাড়ে কাজ করে যাওয়ার শারীরিক সক্ষমতা—প্রভৃতি গুণাবলীগুলিকে ইন্টারভিউয়ের সময় কথোপকথনের মাধ্যমে আপনাকে পরিস্ফুট করতে হবে। এটা করতে পারা নেহাত সহজ কাজ নয়। একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই পারে এ সকল অতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিতে আপনাদের দক্ষ করে তুলতে। গ্রুপ-বি তে পুলিশ সম্পর্কিত বেশ কিছু স্টিরিও টাইপ প্রশ্ন প্রতি বছরই করা হয়। এখানকার মক্ ইন্টারভিউয়ের ক্লাশে যোগ দিলে আপনি সেগুলিও জানতে পারছেন। এটা তথ্য প্রযুক্তির যুগ—যত বেশি তথ্যে আপনি সম্পৃক্ত হবেন, আপনি ততটাই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাবেন। তাই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে পিছিয়ে না থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকুন আর আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত করুন।

বাংলায় ফ্রি নোটসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের 'আর্টিকল' অংশটি লক্ষ্য করুন

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9674478644
✆ 9830770440

Website : www.academicassociation.in ■ Study Centre : Uluberia-9051392240

সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বের বিচারে কেন্দ্রীয় বাজেট—২০১৪

রাজকোষ ঘাটতিতে লাগাম পরিয়ে আর্থিক বিকাশ বজায় রাখা যে কোনও সরকারের কাছেই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে আর্থিক বিকাশ ও আর্থিক সংহতি সাধন—এক কথায় অসাধ্যসাধন। কিন্তু এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলার নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারল কি নতুন সরকারের এই প্রথম বাজেট? ব্যয় কাটছাঁটের পথে না গিয়ে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায়, বাড়িয়ে বা বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে আর্থিক সংহতি সাধনের উদ্যোগ কি আদৌ ফলপ্রসূ হবে? কিংবা ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে মুদ্রাস্ফীতি শুধুমাত্র একটি আর্থিক ঘটনা নয়, বরং সরবরাহের অনিশ্চয়তার ফলশ্রুতিও বটে সেখানে চড়া মুদ্রাস্ফীতির অসুখ কি অর্থমন্ত্রীর 'নয়া আর্থিক কাঠামো'র দাওয়াইতে সারবে? এইসব প্রশ্নেরই বিচার বিশ্লেষণ এই নিবন্ধে। লিখেছেন **ড. লেখা এস চক্রবর্তী**।

বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এসে অনেক অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন অর্থনীতির বিকাশহার একেবারেই নিম্নগামী। সেইসঙ্গে চড়া মুদ্রাস্ফীতি, চলতি খাতে ব্যাপক ঘাটতি এবং কেন্দ্রীয় স্তরে বিপুল রাজস্ব সম্পর্কিত অসামঞ্জস্য নিয়ে সরকারকে প্রথম থেকেই বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত অঙ্কের হিসাব-নিকাশ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না, আমি এই বাজেট সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়েই চিন্তাভাবনা করছি। বাজেট ভাষণে রাজকোষ সম্পর্কিত নীতি ও আর্থিক নীতির সমন্বয় সাধন বা মেলবন্ধন নিয়ে যে চেষ্টা হয়েছে সেটা স্পষ্ট, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী যেখানে 'নয়া আর্থিক কাঠামো'র কথা ঘোষণা করেছেন। রাজস্ব আয় খুঁটিনাটি অঙ্ক, নতুন নীতি ঘোষণা বা বাজেট বরাদ্দের হিসাব নয় বরং এই নিবন্ধে বাজেটের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরই আমরা আলোকপাত করব।

নর্থ ব্লক এবং মিন্টরোডের মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন বেশ চ্যালেঞ্জিং এবং এতদিন পর্যন্ত আর্থিক নীতির চেয়েও রাজকোষ সম্পর্কিত বিষয় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের জন্য অর্থমন্ত্রী যে 'নয়া আর্থিক কাঠামো'র কথা ঘোষণা করেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে যেভাবে আরও বেশি করে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা' চাওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করা দরকার। এবং সেই সঙ্গে 'আর্থিক নীতির কাঠামো সংশোধন ও সুসংহতকরণ' সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের (উরজিৎ প্যাটেল কমিটি রিপোর্ট) পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রীর এই নতুন আর্থিক কাঠামো সম্পর্কিত ঘোষণা কতটা কার্যকর হয় তাই এখন দেখার।

বাজেটের অন্তর্নিহিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বর্তমান সরকারের দুটি বিষয়গত অগ্রাধিকারের কথা স্পষ্ট। যথা—(i) আর্থিক বিকাশের পুনরুজ্জীবন (ii) সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। এই দুটি বিষয় বাজেটের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট একই সঙ্গে 'ধারাবাহিকতা' এবং 'পরিবর্তন'-এর পথে হাঁটতে চেয়েছে। জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি মোকাবিলায় দ্বিমুখীনীতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাজেটের 'ধারাবাহিকতা' নীতি স্পষ্ট, বিশেষত আর্থিক সংহতিসাধনের প্রশ্নে যেখানে পূর্ববর্তী সরকারের পথ অনুসরণ করা হচ্ছে। আবার, বাজেটে নতুন আর্থিক কাঠামোর 'নিউ মানিটরি ফ্রেমওয়ার্ক' নামে যে সমস্ত পরিবর্তনের আভাস দেওয়া হয়েছে তা বেশ গোলমেলে।

১. আর্থিক সংহতি সাধন

আর্থিক বিকাশের পুনরুজ্জীবন এবং আর্থিক সংহতিসাধন—এই দুটো কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। এই দুটো শব্দ পরস্পর বিরোধী এবং একটা চললে অপরটা বাধা পাবে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে আর্থিক পরিণামদর্শিতার কথা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে রাজকোষ ঘাটতির হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪.১ শতাংশে বেঁধে রাখা বর্তমান সরকারের কাছে যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে তা অর্থমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বাজেটে একটা মাঝারি মেয়াদে আর্থিক সংহতি সাধনের পথে এগোনোর কথা বলা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে রাজকোষ ঘাটতির হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩.৬ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ সালে এই ঘাটতির হার জিডিপি-র ৩ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এই বাজেটে।

আর্থিক সমীক্ষায় যদিও বলা হয়েছিল যে, "ভারতে কড়া আর্থিক সংস্কারের দাওয়াই চাই, আর প্রয়োজন একটি কঠোর আর্থিক দায়িত্ব এবং বাজেট পরিচালনা (ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট, এফআরবিএম) আইনের"; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজেটে রাজকোষ ঘাটতিকে জিডিপি-র ৩

সারণি-১
ঘাটতির লক্ষ্য

	২০১৩-১৪ সংশোধিত হিসাব		২০১৪-১৫ বাজেট হিসাব		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা		২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রা	
জিডিপি-র শতাংশের হিসেবে	অন্তর্বর্তী বাজেট	সাধারণ বাজেট	অন্তর্বর্তী বাজেট	সাধারণ বাজেট	অন্তর্বর্তী বাজেট	সাধারণ বাজেট	অন্তর্বর্তী বাজেট	সাধারণ বাজেট
প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি	২.২	২.০	১.৮	১.৬	০.০	০.০	০.০	০.০
রাজস্ব ঘাটতি	৩.৩	৩.৩	৩.০	২.৯	২.০	২.২	১.৫	১.৬
রাজকোষ ঘাটতি	৪.৬	৪.৬	৪.১	৪.১	৩.৬	৩.৬	৩.০	৩.০

সূত্র : ভারত সরকার (২০১৩, ২০১৪) : বাজেট নথি, অর্থমন্ত্রক

শতাংশে কমিয়ে আনায় গৃহীত লক্ষ্য ছাড়া অন্য কিছু বলা হয়নি। যাইহোক, ব্যয় কাটছাঁটের বদলে রাজস্ব আদায় বাড়িয়ে আর্থিক সংহতিসাধনের লক্ষ্য পূরণের একটা অস্পষ্ট আভাস অবশ্য দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক পথের বাইরে এই পদক্ষেপকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়। তবে ঘাটতির লক্ষ্য প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী বাজেটের তুলনায় বর্তমান বাজেটে বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই (সারণি-১)।

এই ঘাটতির লক্ষ্য ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত নতুন এফআরবিএম বিধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নতুন এফআরবিএম বিধি অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি পুরোপুরি দূর করা হবে এবং ওই একই কালপর্বের মধ্যে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি ২ শতাংশের নীচে বেঁধে ফেলা হবে। বর্তমান বাজেটে লক্ষ্যগুলি এক রাখা হলেও আর্থিক সংহতি সাধনের জন্য একটু ভিন্ন পথ নেওয়া হচ্ছে। আর্থিক সংহতি সাধনের অঙ্গ হিসাবে কর-বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৪-১৫ সালে (বাজেট হিসাব) জিডিপি-র ১.৭ শতাংশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ বাবদ কর বহির্ভূত রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক হিসাবনিকাশ মিটিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ২০১৪-র জুনে মালেগাম প্যানেল যে নতুন হিসাবনিকাশ পদ্ধতির সুপারিশ করেছে সেই অনুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এই লভ্যাংশের পরিমাণ সংশোধন করেছে। ২০১৩-১৪ সালে সরকারকে লভ্যাংশ বাবদ যেখানে ৩৩,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল সেখানে ২০১৪-১৫ সালে সরকারকে এই বাবদ ৪৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঋণ বহির্ভূত মূলধনি আয় থেকেও রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা যায়। অন্তর্বর্তী বাজেটে যেখানে বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে ৩৬,৯২৫ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, সেখানে ২০১৪-১৫ সালে বাজেট হিসাবে, এই বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৩,৪২৫ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলিতে ১৫,০০০ কোটি টাকার সরকারি শেয়ারের বিলগ্নীকরণেরও হিসাব রয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আর্থিক সংহতিসাধনের যে বিশ্লেষণমূলক রূপরেখা দিয়েছেন তা আগেকার পরিকল্পনার থেকে একদম আলাদা। খুব আশ্চর্যজনকভাবে অর্থমন্ত্রী বাজার চলতি নব্য ক্ল্যাসিক্যাল রূপরেখা তুলে ধরেননি যেখানে রাজকোষ ঘাটতি বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগকে সংকুচিত করে কিংবা সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।

পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বলে যে রাজকোষ ঘাটতি আদতে সুদের হার বাড়ায় না বা বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত করে না (চক্রবর্তী ২০০২, ২০০৭, ২০০৮, চক্রবর্তী এবং চক্রবর্তী ২০০৬, বিনোদ ২০১৪) এবং সেই সঙ্গেই রাজকোষ সম্পর্কিত নীতির বিষয়ে অবস্থান ও ফলাফলের মধ্যে একটা ভিন্ন যোগাযোগও প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে আর্থিক সংহতি-সাধনের রূপরেখা হিসাবে অর্থমন্ত্রী যার ওপর আলোকপাত করেছেন তা হল—'প্রজন্মান্তরের করের বোঝা অর্থাৎ বর্তমানের ঋণ আগামী প্রজন্মের করের বোঝা।" অর্থমন্ত্রীর এই রূপরেখা একটি কারণে অর্থপূর্ণ যে, সরকার ঘাটতিকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী লক্ষ্যে পরিচালিত করছে যার মধ্যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগও রয়েছে। এতে বেসরকারি কর্পোরেটের বিনিয়োগের ক্ষেত্র মোটেই সংকুচিত হবে না, বরং তা আরও প্রসারিত হবে। অর্থমন্ত্রী যে কাঠামো বা রূপরেখাই প্রয়োগ করুন না কেন, 'বিচার বিবেচনাহীন জনমোহিনী' নীতি থেকে দূরে সরে তিনি যে রাজকোষ ঘাটতি কমানোর ওপর তাঁর ভাষণে জোর দিয়েছেন সেটাই বড় কথা।

২. নতুন আর্থিক নীতির কাঠামো

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে মুদ্রাস্ফীতিই বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা তাও একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি কি শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক ঘটনা? আর্থিক কারণে মুদ্রাস্ফীতি তো অবশ্যই হয় কিন্তু এটাও নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে সরবরাহের অনিশ্চয়তা বা সমস্যাও মুদ্রাস্ফীতিকে সমানভাবে প্রবাহিত করে। ২০১৪-১৫ সালের সাধারণ বাজেটে 'কৃষিক্ষেত্রে মূল্যের ওঠাপড়া'র বিষয়টি মোকাবিলার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে ৫০০ কোটি টাকার মূল্য সুস্থিতকরণ তহবিল (প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফান্ড) গঠন করা হয়েছে।

যাইহোক, সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধ এবং অনাবৃষ্টির কারণে সরবরাহে যে অনিশ্চয়তা বা গোলমাল দেখা দেবে মূল্য নির্ধারণে তার প্রভাব পড়বে। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক পন্থাটিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা উচিত ছিল বাজেটে। কিন্তু তার পরিবর্তে অর্থমন্ত্রী নয়া আর্থিক কাঠামোর

প্রয়োজনীয়তার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী বাজেটগুলির তুলনায় এক লক্ষণীয় পরিবর্তন।

ভারতে আমরা বরাবর রাজকোষ সম্পর্কিত নীতির প্রাধান্যই দেখে এসেছি এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বাজেটের নীতি নির্ধারকরাই সবসময় চালকের আসনে থাকেন। আমি এখানে বলতে চাই যে রাজকোষের প্রাধান্য বলতে অবশ্যই টাকা ছেপে ঘাটতি পূরণকে বোঝায় না (যাকে আক্ষরিকভাবে ঘাটতি পূরণের মুদ্রাটংকন লাভ বা সেইনিওরেজ ফিনান্সিং অফ ডেফিসিট বলে)। টাকা ছেপে ঘাটতি পূরণের প্রথা আমরা কয়েক দশক আগে পেছনে ফেলে এসেছি। মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই নতুন বৃহত্তর বা সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনীতির স্তরে ঐকমত্য যে একটা পদক্ষেপ আমি তার ওপর আলোকপাত করছি। যদি তাই হয়, তাহলে এই বাজেটের কাঠামো নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়ে যায়। এটা কি সত্যিই নতুন সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক (ম্যাক্রোইকোনমিক) নীতির নিয়মে ঐকমত্য?

গত দশকে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ছিল, তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া অবশ্যই অত্যন্ত জরুরি। কারণ সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্তরে (ম্যাক্রোইকোনমিক) মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম হল ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হার এবং আর্থিক সঞ্চয়ের হ্রাস, অবমূল্যায়ন-মুদ্রাস্ফীতির চক্র তথা আয় বণ্টনের অসাম্য (ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদন, ২০১৪)।

বিশ্বব্যাপী মন্দার পর বিশ্বের দেশগুলি আরও বেশি করে এই বিষয়ে সহমত হচ্ছে যে শুধুমাত্র মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কাজে আবদ্ধ না থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির এবার থেকে বহুমুখী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে উরজিৎ প্যাটেলের প্রতিবেদন ভারতে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদক্ষেপের কথা বলেছে। সেই কারণেই নতুন সরকারের কাছে এই প্রতিবেদন নিয়ে উদ্বেগের অবকাশ রয়ে যায়। ছাড় বা নমনীয়তার মাত্রা কতটা হবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের মধ্যে সংযোগসাধন; আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে আর্থিক নীতি ও রাজকোষ সম্পর্কিত নীতির সংযোগসাধনই বা কীভাবে হবে তা নিয়েই নতুন সরকারের মাথাব্যথা থাকছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে স্বাধীনভাবে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা করতে দেওয়ার বিষয়ে নতুন করে আজ যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত এক গুচ্ছ প্রতিবেদনে—যথা ২০০৭ সালের পার্সি মিস্ত্রি প্রতিবেদন, ২০০৯ সালের রঘুরাম রাজন প্রতিবেদন এবং ২০১৩ সালের আর্থিক ক্ষেত্রে আইনগত সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন (এফএসএলআরসি)। এই তিনটি প্রতিবেদনে ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নীতিসমূহ প্রকাশ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর্থিক নীতির রূপরেখার বিচারে উরজিৎ প্যাটেলের প্রতিবেদনেও মোটামুটি একই কথা বলছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতিগত সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আর্থিক নীতির কাঠামোর এই ধরন নতুন সরকারের কাছে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

নব্য কেইনমীয় সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্ব (ম্যাক্রোইকোনমিক্স) রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে নব্য ঐকমত্যভিত্তিক সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্ব (নিউ কনসেনশাস ম্যাক্রোইকোনমিক্স বা এনসিএম) (আরেসটিস, ২০০৯) নামে পরিচিত। এই এনসিএম মতবাদের মূলনীতি সমূহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ বলে, মুদ্রাস্ফীতি একটি আর্থিক বিষয়ভিত্তিক ঘটনা, তাই আর্থিক নীতির মাধ্যমেই মূল্যকে স্থিতিশীল রাখা যাবে; আর সুদের হারের পরিবর্তন করেই একমাত্র মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতিই যে কার্যকরী হাতিয়ার তা এইভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (আরেসটিস, ২০০৯)। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই মত যথেষ্ট বিতর্কিত; কারণ এখানে মুদ্রাস্ফীতি কেবল আর্থিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী 'নয়া আর্থিক কাঠামো'র বিষয় সমর্থন করার পর এই নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ে।

৩. আর্থিক বিকাশের পুনরুজ্জীবন

আর্থিক বিকাশের হার কমে যাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী মন্দাকেই দায়ী করা হয়েছে বারবার। বিকাশহার এইভাবে কমে যাওয়ার পরও দেশের গড় আর্থিক বিকাশের হার অন্যান্য উদীয়মান সাকার অর্থনীতিগুলির তুলনায় বেশি—এই ভেবে কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট থেকেছে। তবে অনেকেই পালটা যুক্তি দিয়ে বিকাশ হার হ্রাসের জন্য সরকারের নীতিপঙ্গুত্বকে দায়ী করেন। আর্থিক বিকাশের পুনরুজ্জীবনের জন্য ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যেমন পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জোরদার রূপায়ণ, খনি সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলির পুনর্বিবেচনা, তথা পণ্য ও পরিষেবা কর সংস্কারের (জিএসটি) লক্ষ্যের পদক্ষেপ এবং বুনিয়াদি ক্ষেত্রগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির মঞ্জুরি ইত্যাদি। আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার এবং আর্থিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলি আর্থিক বিকাশের পুনরুজ্জীবনে বাস্তব ও আর্থিক ক্ষেত্রের অবদানকে আরও শক্তভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

৪. প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকারের আয়তন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ বিকাশ প্রক্রিয়া তথা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যের বিরাট পার্থক্যের কারণ নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের কাছে প্রতিষ্ঠানগুলি যাবতীয় গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে (নেলসন, ২০০৮, অ্যাসেমোগলু এবং রবিনসন, ২০১২)। প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে ঠিক কী বোঝায়? নর্থ (১৯৯১) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সমাজে টিকে থাকার শর্ত, অথবা আরও আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে এগুলি মানুষের তৈরি বিধিনিষেধ যা মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।" নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল 'কম সরকার এবং সর্বোচ্চ প্রশাসন'। প্রশাসন বাজারকেন্দ্রিকও হতে পারে। কেন্দ্রীয় বাজেটে যে ব্যয় সংস্কার কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা যথেষ্ট সাহসী পদক্ষেপ এবং একে সাধুবাদ

সারণি-২ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ব্যয় বাজেট		
মোট	১৭৯৪৮৯২	
অর্থমন্ত্রক	৬৪০৪০৪.২	৩৫.৬৮
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক	২৮৫২০২.৯	১৫.৮৯
উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক	১১৫৯৫২.৬	৬.৪৬
গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক	৮৩৮৫২.৪৬	৪.৬৭
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক	৮২৭৭১.১	৪.৬১
রসায়ন ও সার মন্ত্রক	৭৩৬১৮.৫৫	৪.১০
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক	৬৫৭৪৫.২৮	৩.৬৬
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক	৬৩৫৪৩	৩.৫৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক	৩৯২৩৭.৮২	২.১৯
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক	৩৪৩৪৫.২	১.৯১

সূত্র : ভারত সরকার (২০১৪) : ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট নথি

জানাতে হয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি দপ্তরের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ থাকছে। ২০১৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেট অনুযায়ী সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৮ শতাংশ ১০টি দপ্তরের মধ্যেই সীমিত রয়েছে (সারণি-২)।

পরিশেষে

আর্থিক বিকাশ হার আজ নিম্নমুখী। দেশের অর্থনীতিকে বিকাশের পথে ফিরিয়ে আনতে সম্ভাব্য নীতিগত অগ্রাধিকারগুলিকে চিহ্নিত করাই এখন নতুন সরকারের কাছে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে নীতিগত কোন কোন অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে? এখানে একই সঙ্গে ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বকেন্দ্রিক সহমতের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম টানার কথা বলে এক পরিবর্তনের সূচনা করতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে একটি 'নয়া আর্থিক কাঠামো'র প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন। অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা এবং বিধিনিয়মভিত্তিক আর্থিকনীতির পক্ষে উরজিৎ প্যাটেলের সুপারিশের সঙ্গে একই আলোতে বিবেচনা করা দরকার। সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্তরে রাজকোষ সংক্রান্ত এবং আর্থিক নীতি উভয় বিষয়েই নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যখন যা ঠিক মনে হয় তা করার স্বাধীনতার থেকে যে একটা সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়মের পথে এগোনোর মাধ্যমে একথা পরিষ্কার যে ভারতে এ বিষয়ে একটা নতুন ঐকমত্য তৈরি হচ্ছে। সরকারের নীতিপঙ্গুত্বের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্যও একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়েছে বাজেটে যেমন পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, কর ব্যবস্থার সংস্কার, অপ্রয়োজনীয় ভরতুকি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক সংস্কার। রাজকোষ সংক্রান্ত নীতির আধিপত্য যে ফিরে আসতে চলেছে সেটা জানা কথা; কিন্তু ২০১৪-র কেন্দ্রীয় বাজেটের পর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন তত্ত্ব কি নতুন কোনও জমানার সূচনা করছে? উত্তর দেবে সময়।❑

[ড. লেখা এস চক্রবর্তী অধ্যাপনা করেন।]

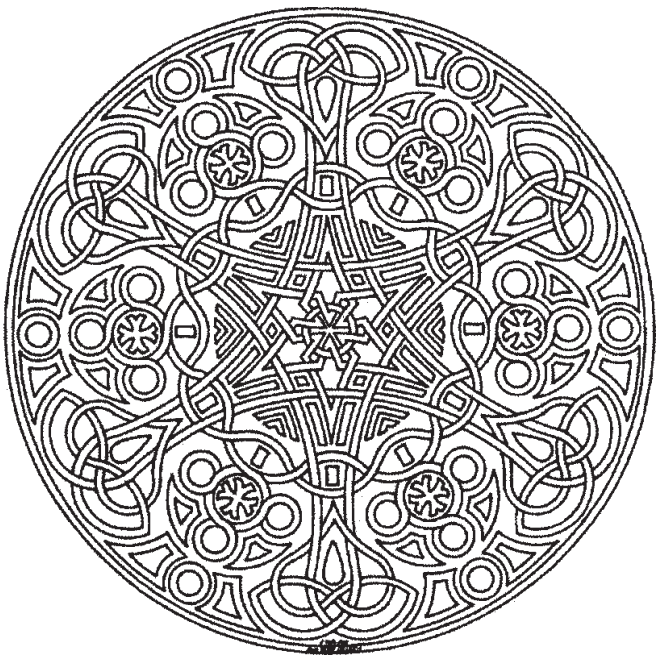

দারিদ্র এবং অপুষ্টির সমাধান সন্ধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশবাসীর স্বাস্থ্যোদ্ধার ও অপুষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যে বহু প্রকল্প ছকা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেছে, এ কথা সগর্বে আজও আমরা ঘোষণা করতে পারি না। অপর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ ছাড়াও যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে সমস্যার আকার নিয়েছে তা হল সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের অভাব। তা না হলে কিছু রাজ্যে এমন ভালো কাজ হচ্ছে কীভাবে। বিশ্লেষণ করছেন **আশা কপূর মেহতা** ও **সঞ্জয় প্রতাপ**।

দারিদ্র এবং অপুষ্টির মোকাবিলায় নতুন সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা এই সরকারের আছে। ২০১৪-১৫-এর সাধারণ বাজেটও সেই কথাই বলে। তবে এমন উদ্যোগ যে এই প্রথমবার নেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন সরকার নানা সময়ে দারিদ্র এবং অপুষ্টি দূরীকরণে এমন অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রায় চার দশক ধরে চলতে থাকা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান (এনআরএইচএম) মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন (মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন)-এর কথা। এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন-এর কর্মকাণ্ড একেবারেই সাম্প্রতিক।

এই প্রবন্ধে মূলত দুটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। এক, দারিদ্র এবং অপুষ্টি দূরীকরণে বিভিন্ন বিস্তারিত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও এই দুটি সমস্যায় আমাদের দেশ এখনও জর্জরিত কেন? আর দুই, আইসিডিএস এবং এনআরএইচএম-এর পর্যালোচনায় থেকে কী কী মুখ্য বিষয় উঠে আসতে পারে যা এই ধরনের অন্যান্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচিকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলবে?

দারিদ্র আজও ভারতের এক অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন স্তরে দারিদ্র মোকাবিলার

সারণি-১
দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন কার্যসূচি ও প্রকল্প : কার জন্য ও কতটা কার্যকরী?

প্রকল্পের নাম	বেঁচে থাকার সামান্য ব্যবস্থাটুকু করতে এই প্রকল্প সক্ষম কি না	কার জন্য? পরিবার না ব্যক্তি?	কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত করাই কি এর উদ্দেশ্যে?	এর থেকে শিশুদের কোনও সুবিধা দেওয়া যায় কি?
রোজগার ও স্বরোজগার প্রকল্পগুলি				
মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন	না	পরিবার	হ্যাঁ	*
স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা	স্থায়ী কোনও রিটার্ন নেই	ব্যক্তি/স্বনির্ভর গোষ্ঠী	হ্যাঁ	*
স্বর্ণজয়ন্তী শহর রোজগার যোজনা				
১) শহুরে স্বরোজগার প্রকল্প	স্থায়ী কোনও রিটার্ন নেই	ব্যক্তি	হ্যাঁ	*
২) শহুরে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প	না	ব্যক্তি	হ্যাঁ	*
৩) মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও রোজগার প্রকল্প	না	ব্যক্তি	হ্যাঁ	*
স্বসহায়ক গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রঋণ	স্থায়ী কোনও রিটার্ন নেই	স্বনির্ভর গোষ্ঠী	কাজের জন্য ঋণ	*
পুষ্টি ও শিক্ষা				
নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা				*
সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা				হ্যাঁ
মিড্‌ডে মিল				হ্যাঁ
সর্ব শিক্ষা অভিযান				হ্যাঁ
স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিমা জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান				হ্যাঁ

নানান কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও সারণি-১ থেকে এটুকু পরিষ্কার হয়ে যায় যে তাদের মধ্যে একটিও কিন্তু ব্যক্তি অথবা পরিবার স্তরে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও করে দিতে পারেনি। মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন-এর মতো কর্মসংস্থান প্রকল্প এমন কোনও কাজের ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি যা একটা গোটা পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া একটি পরিবার সাধারণভাবে দরিদ্র না হলেও সেই পরিবারে মহিলা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী এমন সদস্য থাকতেই পারেন যাঁরা অন্য সমস্যার শিকার। এঁদের জন্য জাতীয় বার্ধক্য পেনশন ও বিধবা পেনশনের ব্যবস্থা থাকলেও তার অর্থের পরিমাণ খুবই সামান্য যে তা জীবনধারণের পক্ষে অপর্যাপ্ত তো বটেই।

টুকরো টাকরা দুই একটা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের যে প্রয়াস সরকার করেছে তা সম্পূর্ণ দারিদ্র দূরীকরণে আদৌ সফল হয়নি। তাই এখন যা দরকার তা হল সমস্ত বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবিলা করা। এমন কর্মসূচির জন্য অবশ্য প্রথমেই দারিদ্র ও তার কারণকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জানা দরকার কী কী কারণে ও কীভাবে একজন মানুষ দারিদ্রের কবলে পড়েন? এর থেকে কেউ কি নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন? হয়ে থাকলে তা কীভাবে? কারও দরিদ্র হওয়ার পেছনে ঠিক কী কী কারণ থাকে? দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম? শিক্ষার অভাব? অপুষ্টি? নাকি এগুলোর সব কটাই? ঠিক কী কী করলে কোনও ব্যক্তি বা পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করা যেতে পারে? দারিদ্রের মোকাবিলায় সরকারের যে নানা প্রকল্প, গ্রামস্তরে তার অগ্রগতির হিসাবই বা কীভাবে রাখা যায়? প্রতিবছর ঠিক কত শতাংশ পরিবার দারিদ্রমুক্ত হচ্ছে তার হিসাবই বা কীভাবে পাওয়া যাবে? দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচিগুলিকে কীভাবে দেওয়া যায় আরও স্থায়িত্ব? দারিদ্রসীমার কাছাকাছি থাকা মানুষদের রক্ষা করার উপায়ই বা কী?

দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি আইসিডিএস এবং এনআরএইচএম-এর পর্যালোচনার মাধ্যমে এবার শনাক্ত করা যাক দারিদ্র ও অপুষ্টি দূরীকরণে কোন কোন বিষয়কে বিশষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এমন কর্মসূচি রূপায়ণে এই চিহ্নিতকরণ খুব কাজে দেয়।

অপুষ্টির নানা কারণ। তার মধ্যে মুখ্য হল দুর্লভ চিকিৎসা ব্যবস্থা, টিকাকরণের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঠিক শিক্ষার অভাব, সন্তানের জন্মের আগে ও পরে মায়ের প্রকৃত যত্ন না নেওয়া, মেয়েদের রক্তাল্পতা সমস্যা এবং অল্প বয়সে বিবাহ ও সন্তানধারণ, কম ওজনের সন্তানের জন্ম, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আবহ এবং নিম্নমানের জল ও অনাময় ব্যবস্থা। যদিও অপুষ্টি সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধানে এখনও প্রয়োজন নানা রকম নতুন ব্যবস্থা তবুও অপুষ্টির মোকাবিলায় আইসিডিএস এবং এনআরএইচএম এই দুই প্রকল্পেরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাধারণ বাজেট ২০১৪-১৫-এ তাই হয়তো আইসিডিএস-এর মতো কর্মসূচিকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণ বাজেট ২০১৪-১৫-এ বর্তমান বছরেই আইসিডিএস প্রকল্পের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৮,১৯৫ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় পুষ্টি অভিযান এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচি (আইসিডিএস সুদৃঢ়করণ ও পুষ্টি জোগানের উন্নত ব্যবস্থা, আইএসএসএনআইপি)-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে আইসিডিএস খাতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৬৯১ কোটি টাকা।

প্রকৃত অর্থেই সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে এক সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান-এর নাম বদলে রাখা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযান বা (এনএইচএম)। টিকাকরণ কর্মসূচি ত্বরান্বিত করা, শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুহার হ্রাস, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই কর্মসূচি গ্রামস্তরেও কার্যকর করা হয়েছে। স্বীকৃত সমাজ স্বাস্থ্য কর্মী (অ্যাক্রেডিডে স্যোশাল হেল্‌থ অ্যাক্টিভিস্ট) বা এএসএইচএ-দের সাহায্যে প্রতিটি গ্রামে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীগুলিকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা যেন অনেকটাই তাদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া গেছে।

উন্নততর ফলাফলের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির প্রণয়ন

মানচিত্রকরণ : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি দারিদ্র মোকাবিলায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাই মানচিত্রের মাধ্যমে এই কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলের কোন কোন এলাকায় এমন কেন্দ্রের অভাব, এই মানচিত্রগুলির সাহায্যে সহজেই বলে দেওয়া যাবে।

গ্রামের যে জায়গায় উঁচু জাতের মানুষজনদের বসবাস, সেখানে এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান সেই সব অঞ্চলে হলে দলিত বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে পরিষেবাগ্রহণ সহজ হয়। তাই গ্রামস্তরে এই ধরনের মানচিত্রের প্রয়োগের দ্বারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির নাগালের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অপুষ্টি জর্জরিত ও বিশেষ রোগক্লিষ্ট ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য

অপুষ্টি ও রোগসমস্যার সমাধান করতে হলে এইসব জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির রূপায়ণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। তা না হলে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানো একরকম অসম্ভব। অত্যন্ত সুখের কথা যে দেশের কুষ্ঠ রোগীর অনুপাত ২০০৫-এর প্রতি দশ হাজারে ১.৮ থেকে বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ হাজারে ১-এরও কম। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ব্লক স্তরে এই অনুপাত এখনও অধরাই। তাছাড়া বর্তমানে ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা ভারতে এক ভয়ানক সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায়, মূলত শহরাঞ্চলের বস্তি ও বেসরকারি সংস্থায় চিকিৎসাধীন, এই বিশেষ যক্ষ্মারোগীদের চিহ্নিতকরণ করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করবার জন্য 'চলমান চিকিৎসালয়' হল এক অন্যতম সফল উপায়। নৌকায়

করে এমন অভিনব চিকিৎসালয়গুলি আসাম ও কেরলে খুব ভালো কাজ করছে। তবে এখনও সারা ভারতে চলমান চিকিৎসালয়ের সংখ্যা মাত্র ২১৩৪ যার ৪৮৮টি, ৩৮৫টি এবং ৩২৯টি যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও ওড়িশা—মাত্র এই তিন রাজ্যেই কাজ করছে। এমন চিকিৎসালয় সংখ্যায় বাড়াতে পারলে ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় সহজেই আনা সম্ভব।

পরিকাঠামো

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি যেমন তেমন করে যেখানে সেখানে স্থাপন করলেই চলবে না। বারান্দা বা কোনও পোড়ো বাড়ি বা কোনও ড্রেনের ধার এইসব কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। পরিষ্কার শৌচালয়সহ এই কেন্দ্রগুলিতে থাকা দরকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। উপযুক্ত খেলার সামগ্রী, ওজন মাপার যন্ত্র ও নানারকমের চার্টসহ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে প্রকৃতই 'মজা করে শেখা'-র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। খুব ভালো হয় যদি সমস্ত সুবিধাসহ কোনও সরকারি স্কুলের পাকাবাড়িতে কেন্দ্রগুলিকে স্থানান্তরিত করা যায়। মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা চালাতে গেলে সব দিকে নজর রাখা খুব দরকার।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য যদি স্থায়ী কোনও ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত না-ই করা যায় তাহলে বাড়িভাড়াখাতে পর্যাপ্ত অর্থ অবশ্যই বরাদ্দ করতে হবে। ঠিক তেমনই স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব যে সমস্ত ব্লকে প্রকট, সেখানে বিশেষ অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘাটতি মেটাতে হবে। মেটাতে হবে পরিকাঠামো ও পরিষেবার অভাব। অর্থাভাব যেন কোনওভাবেই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার খামতির কারণ না হয়ে ওঠে।

কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ

সুসংহত শিশু বিকাশ ও জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান—এই দুই কর্মসূচি সফল করার পেছেনে সেবা কাজে নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান কর্মী থাকা অত্যন্ত জরুরি। খালি পদগুলি ভর্তি করা, কাজের চাপ যাতে বেশি না হয় সেদিকে নজর রাখা এবং কর্মীসহায়ক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শোষণমুক্ত কাজের পরিবেশ এবং কার্যক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও খুব দরকার। আইসিডিএস-এর মতো প্রকল্পে যুক্ত আধিকারিকদের এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও তাঁদের সহকারীদের অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দেওয়া চলবে না। ডাক্তার, নার্স, সহ-নার্স ও ধাত্রী-এর মতো কর্মীদের ঘাটতি পুরণেও নজর দেওয়া খুব দরকার। একজন আইসিডিএস তত্ত্বাবধায়ককে একই সঙ্গে ২০-২৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আশা করা হয় যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা এই কেন্দ্রগুলিতে তিনি প্রত্যহ তত্ত্বাবধানে যাবেন। এদিকে পরিবহণের সুব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় একজন তত্ত্বাবধায়কের উপর এতগুলো কেন্দ্র চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। প্রয়োজনে এঁদের যাতায়াত বাবদ কিছু অর্থও বরাদ্দ করা যেতে পারে। এছাড়া, আইসিডিএস ও এনআরএইচএম কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন সুফল আনতে পারে।

'স্বেচ্ছাসেবী' এবং তাঁদের যৎসামান্য পারিশ্রমিক

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা 'আশা'-এর মতো তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবীরা কিন্তু আইসিডিএস ও এনআরএইচএম-এর মতো প্রকল্পে এক একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাই এই সব কর্মীকে সামান্য দক্ষিণা প্রদান যথেষ্ট নয়। একটি সুরক্ষিত চাকরির যে দাবি এঁরা বহুদিন ধরে করছেন তা কিন্তু নেহাত অন্যায্য নয়। এইসব কথা মাথায় রেখে এই কর্মীদের উপযুক্ত বেতনে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করলে তবেই একমাত্র প্রকল্পগুলি সফল হয়ে উঠতে পারে।

প্রকল্পগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া

দেখা গেছে যে কেন্দ্রায়িত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা কখনওই খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। মানুষ নিজে থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে এসে সুফল লাভ করবে, সবসময় এমন আশা করাটাও ভুল। বরঞ্চ এই পরিষেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া গেলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। ছত্তিশগড় ও ওড়িশার 'মিতানিন কর্মসূচি' এর এক বড় প্রমাণ। একটু বিশদে বলা যাক এই কর্মসূচির কথা। প্রথমেই বাছা হয় এই 'মিতানিন'-দের। বাছেন গ্রামবাসীরাই, তাঁদের নিজেদের গ্রাম থেকে। বাছাই করা এই 'মিতানিন' মহিলাদের প্রশিক্ষিত করেন ব্লক প্রশিক্ষণ দল, পূর্বোল্লিখিত সহ-নার্স ও ধাত্রীরা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তারপর এই প্রশিক্ষিত 'মিতানিন'-রা গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তদ্‌সম্পর্কিত নানান খবর ও তথ্য। 'মিতানিন'-দের এই ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামের মানুষ আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। ছত্তিশগড় ও ওড়িশায় তো লক্ষণীয়ভাবে কমেছে অপুষ্টি ও তজ্জনিত সমস্যা। এর থেকে বোঝা যায় যে আইসিডিএস ও এনআরএইচএম-এর মতো বড় প্রকল্পে কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের হাওয়া আনা দরকার। এমন কিছু প্রক্রিয়া চালু করা দরকার যার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলিকে স্থানীয় স্তরে পর্যালোচনা ও সমর্থন করা যাবে। তাহলে অঙ্গনওয়াড়ি ও 'আশা' কর্মীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কাজটি আরও সহজ হবে এবং আইসিডিএস ও এনআরএইচএম পাবে বৃহত্তর সাফল্য।

জনসমাজের অধিকারবোধ

'নন্দী' ফাউন্ডেশনের পাঁচমুখী মডেল 'বচপন' মধ্যপ্রদেশের রাতলাম জেলায় লক্ষণীয়ভাবে অপুষ্টি সমস্যা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। বচপন মডেলের পাঁচটি দিকের আলোচনায় প্রথমেই আসে আইসিডিএস-এর চাহিদার জন্য জনসমাজ সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার কথা। দ্বিতীয় দিকটি হল নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রামস্তরের সরকারি সেবা কর্মী ও সাধারণ গ্রামবাসী দ্বারা গঠিত 'একতা সমূহ'-এর মতো জনসমাজ ভিত্তিক একটি নজরদারি প্রক্রিয়ার সূচনা। তারই সঙ্গে আছে জনসমাজের নজরদারির জন্য এমন কিছু সহজ ব্যবহারের সরঞ্জাম তৈরি করা যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য সাজানো ও তা বিশ্লেষণ সহজে করা যাবে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সরকারি ও পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মঞ্চ তৈরি আর এই মঞ্চগুলির মাধ্যমে এমন কয়েকটি নতুন ব্যবস্থার সূচনা যার সাহায্যে পরিষেবার ফাঁকফোকরগুলি নির্ধারণ সম্ভব। চতুর্থ হল গোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থা (কমিউনিটি বেস্‌ড

অর্গানাইজেশন) বা সিবিও-এর প্রতিনিধিদের, পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের একে ওপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মঞ্চ সৃষ্টি। সব শেষে হল 'গ্রাম মিত্র' নামক এক শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ এবং সময়ে সময়ে ভালো কাজের জন্য যাবতীয় এই 'গ্রাম মিত্র', স্বাস্থ্যকর্মীদের পুরস্কৃত করা।

একইভাবে শস্য ক্রয় ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, ওড়িশায় 'যাঁচ'-এর মতো গ্রামস্তরের আইসিডিএস পর্যবেক্ষক সমিতি গঠন, গ্রামীণ জনসমাজ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও 'মহিলা মণ্ডল' দ্বারাই খাবার রান্নার ব্যবস্থা আইসিডিএস-এর ব্যাপারে জনসমাজে এক বৃহত্তর অধিকারবোধের জন্ম দিয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে সুফল।

বাজেট

অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং সময়মতো টাকা না এসে পৌঁছানো প্রকল্পগুলির কার্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। কেন্দ্র থেকে রাজ্যে সময়মতো টাকা এসে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন অর্থ বরাদ্দের উপযুক্ত প্রস্তাব গঠন এবং পূর্বের বরাদ্দ অর্থের জমাখরচের হিসাব সহ নিদর্শপত্র প্রদান। অনেক সময় দেখা যায় যে কেন্দ্রের অর্থ অনুদান পূর্ণ সদ্ব্যবহারের অন্তরায় রাজ্যের পক্ষ থেকে অর্থের জোগান না থাকা।

অপুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি এবং অন্যান্য সাধারণ রোগভোগ ভারতের এক বড় সমস্যা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সরকারের জনস্বাস্থ্য খাতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ। দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনও প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে। আসলে মোট খরচের অনুপাতের হিসেবেই হোক বা জিডিপি-র শতকরা হারে, এদেশের সরকার জনস্বাস্থ্যসেবায় খরচ করে বড় কম। পরিসংখ্যান বলে যে ভারতের এক সাধারণ নাগরিকের পেছনে স্বাস্থ্য খাতে যা খরচ হয় তার ৭১.১৩ শতাংশ আসে তার নিজের পকেট থেকে আর মাত্র ১৯.৬৭ শতাংশ দেয় সরকার। যুক্তরাজ্যে কিন্তু জনস্বাস্থ্য খাতে জনপিছু খরচের ৮৭ শতাংশ দেয় সরকার। ফ্রান্সে ও থাইল্যান্ডের সরকারি তরফে এই একই খরচের পরিমাণ কিন্তু যথাক্রমে ৮০ শতাংশ ও ৬৪ শতাংশ। উৎকৃষ্ট মানের জনস্বাস্থ্য সেবা চালু করতে গেলে ভারত সরকারকে, যে করেই হোক, এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াতেই হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারি খরচ জিডিপি-র ০.৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ বা ৩ শতাংশ করার যে প্রতিশ্রুতি তা বাস্তবায়িত করবার জন্য এবং তার সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবায় 'গঠনমূলক সংস্কার' আনার জন্য— এর মতো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন ছিল, বরাদ্দ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম।

অধরা লক্ষ্য

আইসিডিএস এবং এনআরএইচএম-এর মতো প্রকল্পগুলি থাকা সত্ত্বেও অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগ দেশের এক বিরাট সমস্যা। অপুষ্টি দূরীকরণ এবং শিশু ও মায়ের মৃত্যুহার হ্রাসের ব্যাপারে যে সব লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল সেগুলি এখনও দূর অস্ত। তথ্য বলে যে দেশে রুগ্‌ণ নারীর সংখ্যার পুরুষদের থেকে অনেক বেশি। রোগ ও মৃত্যুহারের পার্থক্যও এক চিন্তার বিষয়। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের পিছিয়ে থাকা আরও এক উদ্বেগের কারণ। তবে এও ঠিক যে এই বিষয়ে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রাপ্ত তথ্য একবারেই বিক্ষিপ্ত।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষাই যেন এনআরএইচএম-এর একমাত্র দায়। কিন্তু, নারী স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গতিশীল করে তুলতে প্রসূতির জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মৃত্যুহার হ্রাসের বিষয়টির প্রতি যেমন লক্ষ রাখতে হবে, তেমনই এক সার্বিক পরিষেবা গঠনের মাধ্যমে নজর দিতে হবে নারীর সারা জীবনের স্বাস্থ্য রক্ষায়। এর জন্য নারী ও পুরুষের রোগ সংক্রান্ত তথ্য পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ ও রক্ষা করা প্রয়োজন। চিকিৎসার চাহিদার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের ভিন্ন আচরণের যে তথ্য তা সংগ্রহ করাও খুব দরকার।

নির্ভুল তথ্য

সরকারি সূত্রে পাওয়া ও বিভিন্ন স্বতন্ত্র সূত্রের সংগ্রহ করা তথ্যের মধ্যে কিন্তু অনেক তফাত ধরা পড়ে। তাই নিয়মিত ফিল্ড থেকে সংগ্রহ করা অপুষ্টি, মৃত্যু এবং রোগসংক্রান্ত তথ্য এবং সেই তথ্যের নিয়মিত যাচাই অত্যন্ত জরুরি। অপুষ্টি, রোগভোগ এবং রোগজনিত মৃত্যু সংক্রান্ত মাসিক তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনাধর্মী বৈঠকে প্রতি মাসেই বসতে হবে। উক্ত তথ্যের ব্যবহার ও বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে এইসব বৈঠকে।

প্রসূতি

প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর ঘটনাগুলির হিসাব ও সমীক্ষার মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি সংশোধনী পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশিক্ষণ

কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে ওড়িশায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। ওড়িশার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্লকগুলোয় রোগীদের প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ ও তারপর এমন জ্বরের জন্য বিশেষভাবে গঠিত 'জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র'-গুলিতে এদের দ্রুত পাঠানো সম্ভব হয়েছে এই কর্মীদের তৎপরতা ও দক্ষতার কারণে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রগুলিতে অপর্যাপ্ত ম্যালেরিয়া নির্ণয়কারী সরঞ্জাম থাকার কারণে প্রকৃত চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়েছে।

যৌথ প্রয়াস

পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও এই ব্যাপারে সচেতনতা, পরিষ্কার জল ও অনাময় ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধক্ষম ও নিরাময়ী এক স্বাস্থ্য পরিষেবা অপুষ্টি, রুগ্নতা জনসাধারণ এবং রোগজনিত মৃত্যুর মতো সমস্যার মোকাবিলায় অবশ্য প্রয়োজন। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু, জল ও অনাময়-এর মতো নানা বিভাগকে একত্রিত করে প্রাপ্ত ফলাফল ও সূচকগুলি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যৌথভাবে বসে পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। আর দরকার এই যৌথ পরিকল্পনায় নিদিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা এবং খুব পরিষ্কারভাবে ফলাফল সংক্রান্ত নথিপত্রে তার উল্লেখ করা। একমাত্র তাহলেই হয়তো সুফল লাভের আশা করা যেতে পারে।❑

[আশা কপূর মেহেতা ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ অধ্যাপনা করেন]

আশা এবং আশঙ্কা, দুটিই ছিল

এবারের বাজেট যদিও নবনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার খুব অল্পদিনের মধ্যেই পেশ করে, তবুও সে বাজেটকে ঘিরে মানুষের মনে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল তো বটেই। লেখক **অনিন্দ্য ভুক্ত***-এর মতে ভরতুকি প্রদান, রাজকোষ ঘাটতি কমানোর জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ একটু যেন হতাশ। কোনও স্পষ্ট দিশা বা উদ্দেশ্যবিহীন এই বাজেট পেশের মধ্যে দিয়ে কতটা পরিবর্তন বা সুফল পাওয়া যাবে তাই নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনা।*

আশঙ্কা ছিল, এতদিনের ভরতুকিরাজ এবার ভেঙে চুরমার করে দেবেন, বা অন্তত ভাঙার কাজটিতে হাত দেবেন। দীর্ঘদিন যাবৎ অর্থনীতির সংস্কার প্রক্রিয়াটি 'না ঘরকা, না ঘাটকা' হয়ে পড়ে আছে। এসপার ওসপার একটা দরকার ছিল। আর সেটা করতে গেলে প্রথমেই হাত দেওয়া দরকার ছিল ভরতুকি প্রথাটিতে।

বাজেটের কদিন আগে, ৪ জুলাই, পাশাপাশি একটা প্রত্যাশাও তৈরি হয়েছিল। এবারও অক্ষত থেকে যাবে ভরতুকির দুর্গ। ওইদিন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা কেন স্বেচ্ছায় এই ভরতুকির সুবিধা ছেড়ে দিয়ে বাজার দরে রান্নার গ্যাস কেনেন। আবেদনের সঙ্গে এও জানানো হয় ইন্ডিয়ান অয়েল এবং ভারত পেট্রোলিয়ামের একশো জন কর্মী ইতিমধ্যেই এই সুযোগ ছেড়ে দিয়েছেন। সরকারের এই নরমসরম আবেদনপন্থী মনোভাব দেখেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও জনস্বার্থে সরকার ভরতুকির বাক্সে হাত ঢোকাবেন না।

প্রত্যাশারই জয় হল দশ তারিখের দুপুরে। হাফটাইমের বিরতি-সহ দু ঘণ্টারও বেশি দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে কোনও বিপ্লবের দৃশ্য ছিল না। বরং ছিল একটা গা-বাঁচানো ভাব। বিগত সরকারের শেষ অন্তর্বর্তী বাজেটের মিনি সংস্করণ যেন।

এই বাজেটের একটা ব্যাখ্যা অবশ্য অর্থমন্ত্রী আর তাঁর সমর্থকরা দিয়েছেন। মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে এর চেয়ে বেশি কিছু করে ফেলা একটু কঠিনই ছিল। খুঁতখুঁত করলেও মেনে নেওয়া যেতে পারে। আর মেনে নিয়েও বলে ফেলা যায়, একটি সুবর্ণসুযোগ অর্থমন্ত্রী হাতছাড়া করলেন। নতুন সরকারের তেতো প্রেসক্রিপশনও এই মুহূর্তে মানুষ হয়তো মেনে নিত এই প্রত্যাশায় যে রোগটা এত বেড়ে গেছে যে তেতো ওষুধ ছাড়া পথ ছিল না, রোগটা যা হোক এবার ভালো হবে। কিন্তু আগামী এক বছরে দারুণ কিছু না করে দেখালে মানুষ কিন্তু তখন সহজে কড়া পদক্ষেপ সহ্য করবে না।

যাই হোক, ভবিষ্যতের কথা থাক, ফেরা যাক বর্তমানে। ভরতুকির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ফিরে আসা যাক সেখানেই। যেমনটা মনে করা হয়েছিল ভরতুকি কমানো হবে, সেটা যে হয়নি সেটা আগেই বলেছি। সব মিলিয়ে ভরতুকির পরিমাণ বরং সামান্য বাড়ানো হয়েছে, চিদম্বরম তাঁর শেষ অন্তর্বর্তী বাজেটে যা বরাদ্দ করেছিলেন তার থেকে সামান্য বেশি। চিদম্বরমের ভরতুকি বরাদ্দ ছিল ২,৪৫,৪৫২ কোটি, জেটলি-র বরাদ্দ সেখানে ২,৫১,৩৯৭ কোটি। তফাত একটাই, জেটলি খাদ্য ও সারে ভরতুকির পরিমাণ বাড়িয়ে, কমিয়ে দিয়েছেন পেট্রোপণ্যের ভরতুকি।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভরতুকির এই বিন্যাসে পরিবর্তনটা কেন করা হল বা তাতে লাভটা কী হবে? কেন করা হল তার একটা জবাব অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকেই অন্যভাবে পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রোলের মতো ডিজেলের দামকেও তিনি বিনিয়ন্ত্রিত করে দিতে চান এবং সেটা এ বছরের শেষেই। ভরতুকি কমিয়ে দেওয়াটা অতএব এদিকে একধাপ এগনো মাত্র। আর লাভটা? সেটা বিশেষ হবে বলে তো মনে হয় না। বরং উলটোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভরতুকি দেবার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য তো দাম কমানো। খাদ্য বা সারের ভরতুকি হয়তো ওই দুটি পণ্যের দাম কমাবে, কিন্তু পেট্রোপণ্যের ভরতুকি কমানোয় তার দাম যেটা বাড়বে সেটার আঁচ খাদ্য ও সার তো বটেই, গিয়ে লাগবে অন্য সমস্ত পণ্যের গায়েই। ভরতুকির মোট পরিমাণ যখন কমানো হল না তখন এই পুনর্বিন্যাসের তাই কী অর্থ বোঝা গেল না।

ভরতুকি নিয়ে আরও একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি এই, ভরতুকির বিষয়টি নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে কেন? ভরতুকি যদি থাকে তাতেই বা সমস্যা কী আর যদি না থাকে তাতেই বা সুবিধা কী? আসলে আজ থেকে দু'দশক আগে অর্থনীতির যে সংস্কার প্রক্রিয়ায় ভারত হাত দিয়েছিল তার মূল কথা ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে একটি বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। সেই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ না হবার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনীতিতে ভরতুকি প্রথার রমরমা। এই অবস্থায় মোদী ক্ষমতায় আসার পর দেশের শিল্পমহল প্রত্যাশা করছিল ভরতুকি প্রথা তুলে না দিন তা কমিয়ে সরকার সংস্কার প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াটি চালু করবেন। সেই প্রত্যাশা থেকেই

এত আলোচনা। ভরতুকি প্রথা বন্ধ করে বাজার অর্থনীতির চাকাটিকে আরেকটু গড়িয়ে দেওয়া ভালো কি মন্দ সে আলোচনার জায়গা এটি নয়, তবে এই বিপুল পরিমাণ ভরতুকি অর্থনীতিতে কী সমস্যা ডেকে আনছে সেটা বলা যেতেই পারে।

সমস্যা বলতে এতে রাজকোষ ঘাটতির অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম তাঁর অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজকোষ ঘাটতিকে জিডিপি-র ৪.১ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্য ধার্য করেছিলেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী ভরতুকি বাড়িয়েছেন, ফলে ব্যয় বাড়বে। অন্যদিকে আয়কর কাঠামোয় রদবদল ঘটিয়ে আয়ের রাস্তা সংকুচিত করে ফেলেছেন। আয়করে যে সমস্ত ছাড় দিয়েছেন তাতে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে মোটামুটি ২২ হাজার কোটি টাকার মতো। ফলে অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের ধার্য লক্ষ্যমাত্রাটিকেই তাঁর চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিলেও কীভাবে সেখানে পৌঁছোনো যাবে তার দিশা বাজেটে নেই। বাড়তি আয়ের একটা রাস্তা অর্থমন্ত্রী সন্ধান করেছেন, বিলগ্নীকরণ। অন্তর্বর্তী বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য (৫১,৯২৫ কোটি টাকা) করে গিয়েছিল পূর্বতন ইউপিএ সরকার, সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৮,৪২৫ কোটি টাকা। এই একটা সংগ্রহের ব্যাপারে হয়তো বিশেষ সংশয় নেই, বিশেষত শেয়ার বাজার যেমন চেপে রয়েছে তাতে, কিন্তু সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হবার এত বছর পরেও কিন্তু বিলগ্নীকরণের এই রাস্তাটি নিয়ে বিতর্কের সমাপ্তি ঘটেনি। এক তো সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের পেট চিরে ফেলার তুলনাটি এসে যাই। কেননা এইসব সংস্থা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই এত দামি হয়েছে, দামি হয়েছে বলেই বাজার তার শেয়ার কেনার জন্য উন্মুখ। তাহলে, একটা সংস্থাকে লাভজনক, লোভনীয় করে তোলার পর সেই লাভের গুড় পিঁপড়েকে খেতে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? তাছাড়া আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। এইসব সংস্থাগুলির লাভ থেকে একটি নিয়মিত লভ্যাংশ সরকার পেয়ে থাকে, যা তার আয়ের অন্যতম উৎস। এই রাস্তাটা কিন্তু বন্ধ হয়ে আসছে।

বাড়তি আয়ের আরেকটা উৎসও অবশ্য ঠিক করা আছে। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে স্পেকট্রাম নিলাম। কিন্তু এটাও একটা সাময়িক উৎস। আয় বাড়ানোর জন্য জোর যেখানে দেওয়া দরকার, উৎপাদন ক্ষেত্র, সেখানে তেমন বলবার মতো জোরটা এল কই? গৃহঋণে বাড়তি ছাড়ের ব্যবস্থা করে আবাসন ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তাতে কতটা কাজ হবে বলা মুশকিল। মানুষ কর ছাড়ের সুবিধা পাবে বলে ধার করে বাড়ি কিনতে যায় না, বাড়ি কেনে ধার করে বলে একটু কর ছাড়ের সুবিধা চায়। আর ফ্ল্যাট বা বাড়ির দাম এই মুহূর্তে বেশি না বাড়লেও, যতটা যা বেড়ে বসে আছে তাতে শুধুমাত্র এই ছাড়ের ওপর ভরসা করে কতটা কী হবে বলা মুশকিল। এছাড়া জোর দেওয়া হয়েছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে। পরিকাঠামোর ব্যাপারটি তো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়, সেখান থেকে কবে কী আয় হবে তার ভরসা না করাই ভালো। আর কৃষিক্ষেত্র তো কার্যত কর আওতার বাইরে।

সব মিলিয়ে রাজকোষ ঘাটতি কীভাবে কমবে, কতটা কমবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। আর রাজকোষ ঘাটতিকে সামাল দেওয়া না গেলে, যেটা আগেই বলেছি, অভ্যন্তরীণ বাজারে দামস্তর বাড়বে। দামস্তর বাড়াটা এই মুহূর্তে অর্থনীতির সামনে একটা বড় সমস্যা। করে ছাড়-টাড় দিয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় হয়তো একটু বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেটা তো সমাধান নয়। তাছাড়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর কজন? যেটা বিশেষ করে দরকার ছিল খাদ্যের দামে একটা আগল পরানো। সেটার কোনও চেষ্টা নেই। এ বছর বর্ষা এখনও পর্যন্ত আশানুরূপ হয়নি। বর্ষার ঘাটতিটা থেকে গেলে খাদ্যের দাম আরও বাড়বে। অর্থমন্ত্রীর অনেক হিসেবই তখন গোলমাল হয়ে যাবে।

বাজেটের খুঁটিনাটি আলোচনার উদ্দেশ্য, এই পর্যন্ত পড়ার পর বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বাজেটের দিশাটিকে ধরার। আলোচনা থেকে এও বোঝা যাচ্ছে তেমন কোনও দিশামুখ আমাদের চোখে পড়েনি। তবে এর মধ্যেই বেশ কিছু তারিফযোগ্য পদক্ষেপ অর্থমন্ত্রী নিয়েছেন। যেমন, গঙ্গা পরিশোধন প্রকল্পে বাড়তি বরাদ্দ, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি জোর। তেমনি এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলার নিদর্শনও আছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি নির্মাণে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ! অর্থনীতি ও রাজনীতি সব দেশেই গায়ে গা লেপটে চলে। কিন্তু দুইয়ের এইরকম এক দেহে লীন হয়ে যাবার নিদর্শনও খুব কম আছে। যতদিন তা থাকবে ততদিন বাজেট এইরকমই হবে, এখানে একটু দুধ, ওখানে একটু চোনা। দিনের শেষে কাণ্ডারিবিহীন অর্থনীতি মাঝনদীতে উদ্দেশ্যহীন ঘুরপাক খাবে।❑

বাজেটে কৃষি, গ্রামীণবিকাশ ও কর্মসংস্থান

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। তাই কৃষি তথা গ্রামের মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা মাথায় রেখে সদ্য-ক্ষমতায় আসা সরকার বেশ কিছু সুস্পষ্ট প্রস্তাব রেখেছে এবারকার বাজেটে। উদ্দেশ্য, গ্রামের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায়, পরিচ্ছন্নতাবোধ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধান, কর্মসংস্থান এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সবরকম সুবিধা প্রদান। এতে কৃষির উন্নতি ঘটবে, দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হবে এবং গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। লিখছেন **লক্ষ্মীনারায়ণ শীল।**

ভারতের অর্থনীতি যে সংকটের মধ্যে রয়েছে তা মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ২০১৩-১৪ সালের আর্থিক সমীক্ষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। মে '১৪-তে মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে পাঁচ মাসে সর্বোচ্চ ৬.০১ শতাংশ। তাই খাদ্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণও জরুরি। এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের বিপুল রাজকোষ ঘাটতি। এই বছরের চলতি দু'মাসে এর পরিমাণ ২.৪ লক্ষ কোটি টাকা। এটা বাজেটের মোট অর্থের ৪৫ শতাংশেরও বেশি। অন্তর্বর্তী বাজেটে এই ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে জাতীয় আয়ের ৪.১ শতাংশ। আবার কর বাবদ আয় অন্তর্বর্তী বাজেটে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের ঘোষণা অনুযায়ী বাড়ার কথা ১৯ শতাংশ, অথচ বেড়েছে মাত্র ৩.১ শতাংশ। কর থেকে আয় এত কম হওয়ায় রাজকোষ ঘাটতি ৪.১ শতাংশ মাত্রায় সীমিত রাখাও সম্ভব হবে না। এই সময়ে ইরাকে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশে পেট্রোপণ্যের দামও বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারও কমেছে। আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী (২০১৩-১৪) এই বৃদ্ধি বর্তমান অর্থবর্ষে ৬ শতাংশের কম হবে বলে পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে (জিডিপি বৃদ্ধির হার)। আগামী ২০১৬-১৭ সালের আগে দেশের আর্থিক উন্নতির হার ৭-৮ শতাংশ দেখা দেওয়ার আশা নেই বলে আর্থিক সমীক্ষায় সুদিনের জন্যে ('achche din') কমপক্ষে দু'বছর জনসাধারণকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এজন্যে উন্নত দেশগুলির অর্থনীতির দ্রুত জোরালো উন্নতি ভারতের সহায়ক হবে। এইসঙ্গে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাবে অনাবৃষ্টিতে কৃষিতে সমস্যাও প্রকট হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে ভরতুকি পরিমাণ এখন জাতীয় আয়ের ২.২ শতাংশ। খাদ্যে ভরতুকির পরিমাণও বাড়ছে। সমীক্ষায় দেখা যায় মোট সরকারি ব্যয়ের মধ্যে খাদ্যে ভরতুকি পরিমাণ ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪.৫৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫-তে ৬.৫২ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্য সুরক্ষা আইনে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে খাদ্য সরবরাহে ভরতুকির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর রিপোর্ট "জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব"-এ জানানো হয়েছে যে ভারতে অনাবৃষ্টি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক তুষারপাতের ফলে খাদ্যোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবার, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রধান কয়েকটি ফসলের উৎপাদন (কেজি/হেক্টরস) হারও বেশ কমেছে। সারণি-১ থেকে এ বিষয়টি বোঝা যাবে।

সারণি-১
প্রধান ফসলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হ্রাস (কেজি)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
খাদ্যশস্য (Foodgrains)	২১২৮	২০৯৫
দানাশস্য (Cereals)	২৪৪৯	২৪২৯
ডাল (Pulses)	৭৮৯	৭৭০
চাল (Rice)	২৪৬২	২৪১৯
গম (Wheat)	৩১১৭	৩০৫৯

সূত্র : ইকনমিক সার্ভে ২০১৩-১৪

সারণি-২
খাদ্যপণ্যের সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি (%)

	অর্থবর্ষ ২০১০ থেকে ২০১৪-র মধ্যে
ধান (Paddy)	৩১
গম (Wheat)	২৭
ভুট্টা (Maize)	৫৬
অরহর (Arhar)	৮৭
আখ (Sugarcane)	৬২
সরিষা (Mustard)	৬৭

সারণি-৩ ভারতে খাদ্য উৎপাদন (মিলিয়ন টনস্) ও রপ্তানি		
		রপ্তানি
২০০৯-১০	২১৮.১	৮.২
২০১০-১১	২৪৪.৫	৮
২০১১-১২	২৫৯.৩	১০.১
২০১২-১৩	২৫৭.১	১১.৮
২০১৩-১৪	২৬৪.৪	১১.৯

এজন্যে কৃষিপণ্যের দামও বেড়েছে এবং ভরতুকিও বাড়াতে হয়েছে। সারণি-২ থেকে ২০১০ ও ২০১৪ সালের মধ্যে কীভাবে খাদ্যপণ্যের সর্বোচ্চ সহায়ক মূল্য বাড়ানো হয়েছে তা স্পষ্ট হবে। এর ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা ক্রমাগত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি থেকেই স্পষ্ট হয়। সারণি-৩ থেকে এই বিষয়টি তথ্যে প্রকাশ হবে।

ভারতের কৃষিপণ্যের রপ্তানিও এর ফলে বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির হারও ২০১০-১১-র ৮.৬ শতাংশ থেকে কমে ২০১১-১২-তে ৫ শতাংশ এবং ২০১২-১৩-তে ১.৪ শতাংশ হলেও ২০১৩-১৪-তে বেড়ে হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। তাই এবারের বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষিক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কৃষিকে প্রতিযোগিতামূলক ও লাভজনক করে তুলতে বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবর্ষে (২০১৪-১৫) কৃষিঋণের পরিমাণ বিগত বছরের থেকে এক লক্ষ কোটি বাড়িয়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে ব্যাংকগুলি এই লক্ষ্যমাত্রাও পার করতে পারবে। স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণে সুদ ৭ শতাংশ ও সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ হলে কৃষকদের আরও ৩ শতাংশ সুদ কম করার প্রকল্প ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত চালু রাখার সুপারিশ মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে রেখেছেন।

বাজেটে গ্রামীণ পরিকাঠামো প্রসারে অর্থমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। খাদ্যের পরিবহণ ও অপচয় হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটে বৈজ্ঞানিক গুদাম তৈরিতে অর্থমন্ত্রী ৫০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছেন। ভারতে প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের অভাবে অপচয় ঘটে। এই ব্যবস্থায় বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ গড়ে তুলতে পারলে খাদ্যের অপচয় কমবে ও জোগান বৃদ্ধি পাবে ফলে মূল্যবৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রিত রাখা যাবে।

কৃষি ও সংযুক্ত ক্ষেত্রে সম্পদ তৈরি বিশেষ জরুরি। এজন্যে দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা চালু করতে নাবার্ডের মাধ্যমে সমবায় ব্যাংক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলিতে পুনর্ঋণ সহায়তার (refinance support) জন্যে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী তহবিল গঠনের (Longterm Rural Credit Fund) সুপারিশ রেখেছেন। এইভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে কৃষিক্ষেত্রকে আরও স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

দেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বেশি। নাবার্ডের মাধ্যমে এদের যৌথ দায়বদ্ধ গোষ্ঠীগুলিকে আরও উৎপাদনমুখী করে তুলতে পারলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিপণ্য রপ্তানিও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এজন্যে পাঁচ লক্ষ এরূপ যৌথ কিষাণ দায়বদ্ধ গোষ্ঠীকে কৃষিঋণ দেবার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

দেশের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা এখনও প্রসারিত হয়নি। অথচ সেচের জল না হলে ফসল নষ্ট হবে ও কৃষকের মূলধন বা বিনিয়োগ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কৃষিক্ষেত্রে সেচের জল সুনিশ্চিত করতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা শুরু করতে বরাদ্দ রেখেছেন ১০০০ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎসাহিত করতে, যাদের উপর ভরতুকির পরিমাণ অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে প্রস্তাবিত অর্থ ৬৭৯৭০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭২৯৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন। আমদানিকৃত ইউরিয়ার জন্যে ১২৩০০ কোটি টাকা, দেশি ইউরিয়ার জন্যে ৩৬০০০ কোটি টাকা এবং ফসফেট, পটাশে ২৪৭৬০ কোটি টাকা ভরতুকি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে কৃষিক্ষেত্র কিছুটা চাঙ্গা হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ও সারের অপপ্রয়োগ রোধ করতে দরকার মাটি পরীক্ষা। এতে জানা যাবে কতটা সার প্রকৃতপক্ষে কৃষি উৎপাদনের জন্যে দরকার হবে। অতিরিক্ত সার প্রয়োগে মাটির স্বাস্থ্যহানিও হতে পারে। তাই ১০০টি চলমান মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র কোন জমিতে কোন সার কতটা প্রয়োজন তা কৃষককে জানতে সাহায্য করা যাবে। এজন্য ৫৬ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষার গবেষণাকেন্দ্র দেশে যথেষ্ট নয়। এতে কৃষকদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ও হচ্ছে। তাই মাটি পরীক্ষার গবেষণাকেন্দ্র তৈরির জন্যে আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রত্যেক কৃষক যাতে 'মাটির স্বাস্থ্যকার্ড' পান তাও দেখা হবে।

কৃষি উৎপাদন বাড়লেই কৃষকের আয় বাড়ে না। এজন্যে দরকার সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা। তাই বাজেটে নাবার্ডের সহায়তায় আগামী দু'বছরে সারা দেশে আরও কমপক্ষে দু'হাজার 'উৎপাদক-সংগঠন' তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এতে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদন বিপণন করতে পারবেন। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর দাপট এভাবে কমলে কৃষকের আয় বাড়বে। রাজ্যগুলিকেও এই কৃষিবাজার সংগঠিত করতে উদ্যোগী হতে হবে।

কৃষকদের উৎপাদিত শস্য ও সবজি সংরক্ষণের জন্য গুদামের ব্যবস্থা ও খাদ্যসংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহিত করা দরকার। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্যমূল্য আরও বাড়বে এবং অসময়ে খাদ্যের জোগান সম্ভব হবে। এ কাজে প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে বাজেটে ৬ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যপণ্যের দাম কমবে, ও কৃষকের লাভ বাড়বে।

কৃষির আধুনিকীকরণ করতে ও প্রযুক্তি প্রয়োগে উন্নত করে তুলতে কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসারও দরকার। এজন্যে ৬টি নতুন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করার প্রস্তাবও

সারণি-৪ কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রবণতা	
বৎসর	**বৃদ্ধির হার**
২০০৯-১০	৮.২
২০১০-১১	৮
২০১১-১২	১০.১
২০১২-১৩	১১.৮
২০১৩-১৪	১১.৯

বাজেটে রয়েছে। অসম ও ঝাড়খণ্ডে এইরকম দু'টি প্রতিষ্ঠান চালু করতে ১০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেলেঙ্গানা ও হরিয়ানায় আরও দু'টি উদ্যানবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষিপণ্যের অংশ মাত্র কয়েক বৎসরে অনেকটাই বেড়েছে। সারণি-৪ থেকে এই বিষয়টি দেখা যাবে।

তাই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে কৃষি উৎপাদন ও উদ্যান ফসল, ফুল-এর উৎপাদন বৃদ্ধিও জরুরি। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের তথ্যানুযায়ী দেশে নগরোন্নয়নের জন্যে ১৬,০০০ বর্গকিমি (০.৮ শতাংশ) মোট কৃষি জমি কমেছে। এই নগরায়ণের ফলে অনেক কৃষকও কর্মহীন হয়েছেন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৬তম ও ৬৮তম সমীক্ষা অনুযায়ী কৃষি, বন ও মৎস্যচাষে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল ৫৯.৯ শতাংশ এবং ২০১১-১২-তে এই সংখ্যা কমে হয়েছে মাত্র ৪৮.৯ শতাংশ। দেশে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আবার বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যাও কমছে। অবশ্য এজন্যে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রভাবও দায়ী। ২০১১-১২-তে আরও ২৫ শতাংশ গ্রামীণ মহিলা শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছেন। এইসব কর্মহীন ও শিক্ষিত গ্রামীণ মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্যে তাই শহর এলাকায় সবজি ও ফলের চাষ করার উদ্যোগ দরকার। শহরাঞ্চলে দরিদ্র মানুষেরা তাদের আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করে। চীনেও এজন্যে ৫২ শতাংশ ব্যয় করতে হয়। তাই স্থানীয় উৎপাদন নগরাঞ্চলে বৃদ্ধি করতে পারলে উৎপাদন ব্যয় ও দাম কমবে। গুদামের ও পরিবহণের ব্যয় এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর উপদ্রবও হ্রাস হবে।

উল্লেখ করা যায় যে চীন, ব্রাজিল ও অন্যান্য দেশের নগর পরিকল্পনায় এই নীতি গ্রহণে সুফল পাওয়া গেছে। কিউবায় কোনও জমি চাষ না করে ফেলে রাখা যাবে না, এমনকী কৃষিমন্ত্রকের বাগানও—এই নীতি ১৯৯৮-তে গৃহীত হওয়ায় ১৯৯৭ সালের সবজি উৎপাদন (শহরের কৃষি) ২০,৭০০ মেট্রিক টন থেকে ২০০৯-তে হয়েছে ২,৮৫,২০০ মেট্রিক টন। হাভানায় নগর কৃষি পরিকল্পনায় ৮৭০০০ একর জমি যুক্ত করায় ২০০৭ সালে প্রায় ৪৪০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কাজে ৪০ শতাংশ পরিবারই অংশগ্রহণ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় জানা যায় (United States Department of Agriculture) ডলার মূল্যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি উৎপাদন শহরাঞ্চলে মোট কৃষি জমির ১/৯ অংশে সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলেও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে নগরকৃষিকাজে অনেক কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ও মানুষদের সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে। সাও পাওলোর খালি জমিতে কমিউনিটি গার্ডেন গড়ে উঠেছে। ফলে অনেক শহরে গ্রামীণ মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি সম্ভব হয়েছে এবং গরিবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। [ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, মে ২৪, ২০১৪] এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকেও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিশেষ উন্নয়নে বাজেটে ৫৩,৭০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিশ্বে জৈব খাদ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এই অঞ্চলে জৈব চাষের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাজেটে হয়েছে। এই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে টিভি চ্যানেল 'অরুণ প্রভা' চালু করার ঘোষণাও অর্থমন্ত্রী করেছেন। এতে এই অঞ্চলের সকল মানুষই উপকৃত হবেন।

কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশের জন্য সমবায় ব্যাংক ও প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকে দায়িত্ব প্রদান করা দরকার। কারণ গ্রামীণ মানুষদের স্বার্থে এরা নিযুক্ত। এই সমবায়গুলিতে স্বল্পসঞ্চয় ভাণ্ডারও বিশাল। এগুলির পরিকাঠামোও রয়েছে। উল্লেখ্য যে মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যে দেশে কৃষি ও সংযুক্তক্ষেত্রের অংশ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের (১৯৫১-৫৬) ৩১ শতাংশ থেকে কমে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৭-১২) হয়েছিল মাত্র ১৮.৫ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে ঋণপ্রদানে এই সমবায়গুলির অংশ মোট কৃষিঋণের ১৮ শতাংশ (২০০৬-০৭) থেকে কমে ২০১১-১২-তে হয়েছে ১৭ শতাংশ (আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির অংশ ১১ শতাংশ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ৭২ শতাংশ)। দেশের আর্থিক উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতেও যথেষ্ট বিনিয়োগ দরকার। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী চীনের বিনিয়োগ ২০০১ সালে ০.৯৫ শতাংশ (জিডিপির) থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ১.৮৪ শতাংশ হলেও ভারতের অবস্থান প্রায় একই রয়ে গেছে—২০০১-তে ০.৭৩ শতাংশ ও ২০১১-তে ০.৮১ শতাংশ মাত্র।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে দেশের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও তাঁত শিল্পের উন্নয়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথায় এই শিল্পগুলি হল দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড (backbone of our economy)। এখানে দেশের শিল্প উৎপাদনের বৃহৎ অংশ পাওয়া যায় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। এইসব শিল্পের ৩৩ শতাংশ হল পরিষেবা ইউনিট ও ৬৭ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। দেশের

গ্রামীণ এলাকায় এই শিল্পের প্রায় ৪৫ শতাংশ কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

কেন্দ্র সরকারের তথ্যানুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মোট সংখ্যা প্রায় ৩২৩১৫৫২ হাজার (২০০৯-১০)। এইসব শিল্পের উন্নয়নে ১০,০০০ কোটি টাকার তহবিলের সুপারিশও বাজেটে করা হয়েছে। প্রযুক্তি, উদ্যোগ ও আবিষ্কার কাজের জন্যে এবং কৃষিযুক্ত শিল্পের উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। হস্ত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে আরও ৫০ কোটি টাকা রবাদ্দ করা হয়েছে। এতে ট্রেড ফেসিলিটেশন সেন্টার এবং হস্তশিল্প সংগ্রহালয় গড়ে তোলা হবে। আরও ৬টি টেক্সটাইল মেগাসেন্টার গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলি সংগঠিত হবে বেরিলি, লখনউ, সুরাট, কচ, ভাগলপুর, মহীশূর ও তামিলনাড়ুতে। একটি হস্তকলা অ্যাকাডেমি গঠন করার জন্য ৩০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে স্থানীয় হস্তশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যেও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই পদক্ষেপ সফলভাবে কার্যকর করতে পারলে দেশের গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি ও শহরে কর্মসংস্থানের উন্নতি সম্ভব হবে।

গ্রামীণ এলাকায় স্বনিযুক্তি ও মজুরি দিয়ে কাজের সংস্থান করতে এবং কৃষি ও সংযুক্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের (MGNREGA) বিন্যাসে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনে মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি যাতে ৪ শতাংশ সুদে আরও ১০০টি জেলায় ব্যাংকঋণের সুযোগ পায় তার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫০টি জেলায় এই সুবিধা চালু আছে। গ্রামের তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বাড়াতে ও উদ্যোগী হতে একটি প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে (Start Up Village Entrepreneurship Programme), যাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা।

গ্রামীণ এলাকায় আবাসনের ব্যবস্থা করতে ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাংকের তহবিলে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি করতেও বাজেটে ১৪৩৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পাবলিক রোড ট্রান্সপোর্টে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ৫০ কোটি টাকা পাইলট প্রকল্পে ধরা হয়েছে। শহর এলাকাতেও মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মদিনে সারা ভারতে প্রত্যেক পরিবারের টোটাল স্যানিটেশন সুনিশ্চিত করার ওপরও কেন্দ্র সরকার জোর দিয়েছে। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় এটি আবশ্যক।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রুরাল-আরবান মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় পরিকাঠামো তৈরি ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা চালু করে আর্থিক উন্নয়ন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও বাজেটে রয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে ২০,০০০ আর্সেনিক ইত্যাদিতে আক্রান্ত এলাকায় ন্যাশনাল রুরাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রোগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে ৩৬০০ কোটি টাকার সংস্থানও বাজেটে রাখা হয়েছে।

এ যাবৎ বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষাই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এবারের বাজেটে উচ্চশিক্ষার সার্বিক উন্নতিতে জোর দিয়েছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। অবশ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার উন্নতিতেও জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের বিকাশে একটি শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল (KISAN TV) চালু করার আশ্বাসও বাজেটে রয়েছে (১০০ কোটি টাকা)। এতে গ্রামীণ কৃষিজীবীদের শিক্ষা, সচেতনতা ও সুরক্ষা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। উচ্চ শিক্ষার নতুন পদক্ষেপে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে বাজেটে 'পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা' খাতে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এতে দেশের প্রায় কুড়ি হাজার শিক্ষক লাভবান হবেন। সর্বশিক্ষা খাতে গতবারের চেয়ে এই বাজেটে বরাদ্দ বেড়েছে ১০০০ কোটি টাকা। এখন কেন্দ্রীয় সাহায্য ওই খাতে বেড়ে হল ২৮৬৩৫ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা মিশন খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৪,৯৬৬ কোটি টাকা। দেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যের উন্নতিতে জোর দিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। এইসঙ্গে ১৫টি 'মডেল গ্রামীণ স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র' গড়ার প্রস্তাবও বাজেটে রয়েছে। দরিদ্র মানুষদের জন্যে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থাতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দেশে কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদনের পরিস্থিতি ক্রমশ অনুকূল হচ্ছে। অক্টোবর ২০১২-তে শিল্পোৎপাদনের হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এ বছরের এপ্রিল ২০১৪-তে এই হার কমে হয় ৩.৪ শতাংশ। পুনরায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী মে, ২০১৪-তে শিল্পোৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। তাই আশা করা যায় দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারও শীঘ্র বাড়বে। সরকারের পক্ষে আরও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করাও সহজ হবে। মাত্র ৪৫ দিনে নতুন সরকার যে বাজেট রেখেছেন—আশা করা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে দেশের কৃষি, গ্রামীণ বিকাশ, কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করতে সরকার আরও জনহিতকর পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করবেন।❑

এ বছরের বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই, ২০১৪

২০১৪-১৫ রেল বাজেটের সারাংশ

জোর: ১) নিরাপত্তা ২) প্রকল্প সমাপন ৩) খাদ্য সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজরদারিসহ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য/পরিষেবা ৪) আর্থিক নিয়মানুবর্তিতা ৫) সহায় সম্পদ সংগ্রহ ৬) তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোগ ৭) স্বচ্ছতা এবং ব্যবস্থার উন্নয়ন।

দেশের রেল ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- রেলকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার সমমূল্যের সামাজিক পরিষেবা দিতে হয়। আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয় করেই এই পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই পরিমাণ, রেলের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ১৬.৬ শতাংশ কাছাকাছি এবং বাজেট থেকে রেলের জন্য পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক অর্থ এজন্য ব্যয় করতে হয়।
- রাজস্ব আয় হ্রাস পাচ্ছে; রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পর্যাপ্ত সহায়সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে না।
- রেলের মাশুল নীতিতে যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি নেই; রেলের যাত্রী ভাড়া ব্যয়ের তুলনায় কম রাখা হয়; ২০০০-০১-এ প্রতি যাত্রী কিলোমিটারে রেলের ক্ষতি ১০ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩-য় ২৩ পয়সা দাঁড়িয়েছে।
- রেলের মাধ্যমে মাল পরিবহণের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান।
- শুধুমাত্র চলতি প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতেই ৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন।
- অর্থের সংস্থানের কথা না ভেবে এতদিন পর্যন্ত বেশি বেশি করে প্রকল্প অনুমোদনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত ৩০ বছরে ১,৫৭,৮৮৩ কোটি টাকার সমতুল ৬৭৪টি রেল প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১৭টি সমাপ্ত হয়েছে। বাকি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ১,৮২,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন।
- রেলের মোট আয়ের অধিকাংশই জ্বালানি, কর্মীদের বেতন এবং পেনশন, লাইন এবং কোচ সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য ব্যয় করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে রেলের মোট আয় হয়েছিল ১,৩৯,৫৫৮ কোটি টাকা, একই সময়ে ব্যয় হয়েছিল ১,৩০,৩২১ কোটি টাকা।
- সরকারকে বাধ্যতামূলক লভ্যাংশ এবং লিজের জন্য অর্থ দেওয়ার পর ২০০৭-০৮-এ ১১,৭৫৪ কোটি টাকা বাড়তি আয় হয়েছিল। এই পরিমাণ চলতি অর্থবর্ষে কমে মাত্র ৬০২ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

দিশা পরিবর্তন এবং নতুন উদ্যোগ

- দেশের বিভিন্ন রুটে রেলপথের ওপর ট্রেনের ভিড় কমাতে সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাইনের ওপর জোর দিয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজ করতে হবে।
- ভাড়া এবং মাশুলের সাম্প্রতিক বৃদ্ধির ফলে রেলের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে ৮,০০০ কোটি টাকা।
- সহায়সম্পদ সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে বিকল্প পথের সন্ধান করা দরকার:
  - রেলের অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিনিয়োগযোগ্য অতিরিক্ত সহায়সম্পদ রেলের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লগ্নি করতে হবে।
  - অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং রেল পরিকাঠামোয় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ।
  - সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের নীতি গ্রহণ।
- 'প্ল্যান হলিডে' বা পরিকল্পনা অবকাশের মতো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার।
- রেলের চলতি প্রকল্পগুলিকে সমাপ্ত করতে সময় এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সিদ্ধান্তে সমর্থক ব্যবস্থা প্রয়োজন।
- কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং বাইরে থেকে জিনিসপত্র ক্রয়ে স্বচ্ছতার প্রয়োজন।
- আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির জায়গায় দেশে নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ।
- ইঞ্জিন, কোচ এবং ওয়াগন লিজ দেওয়ার বাজার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫৮টি নতুন ট্রেন চালু করা (যার মধ্যে রয়েছে ৫টি জনসাধারণ, ৫টি প্রিমিয়াম, ৬টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেস ট্রেন, ২৭টি এক্সপ্রেস, ৮টি প্যাসেঞ্জার, ২টি মেমু ও ৫টি ডেমু ট্রেন) ছাড়াও ১১টি ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবারের বাজেটে। এগুলি ছাড়া রেল ব্যবস্থার উন্নতি এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থা এবারের রেল বাজেটে নেওয়া হল, এর মধ্যে অন্যতম হল :

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য/পরিষেবা এবং পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য সরবরাহসহ স্টেশন পরিচালন ব্যবস্থা

- দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান স্টেশনগুলিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পায়ে চলার ওভারব্রিজ, চলমান সিঁড়ি এবং লিফ্ট-এর সংস্থান।

- স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, যাত্রীদের জন্য আশ্রয় এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা।
- দেশের সমস্ত প্রধান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবীণ নাগরিক এবং অন্যভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে কর্পোরেট সংস্থা, ব্যক্তি, অ-সরকারি সংগঠন, অছি এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা।
- নির্দিষ্ট কিছু ট্রেনে অর্থের ভিত্তিতে 'ওয়ার্ক স্টেশন'-এর ব্যবস্থা করা।
- ট্রেন, কোচ, বার্থ এবং চেয়ার কারের অনলাইন বুকিং-এর ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।
- একইসঙ্গে পার্কিং তথা প্ল্যাটফর্ম টিকিটের ব্যবস্থা।
- রেলের রিটায়ারিং রুমগুলি সংরক্ষণের জন্য ই-বুকিং-এর ব্যবস্থা।
- ধাপে ধাপে নামী ব্র্যান্ডের খাবারের তাৎক্ষণিক প্যাকেটের ব্যবস্থা।
- গুণমান সুনিশ্চিত করার জন্য জাতীয় অডিট ব্যুরো স্বীকৃত তৃতীয় পক্ষ অডিট সংস্থার মাধ্যমে অডিটের ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন ট্রেনে খাদ্যের গুণমান বিষয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানতে ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থা।
- ই-মেল, এস.এম.এস. বা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে চলমান ট্রেন থেকে যাত্রীরা যাতে নির্দিষ্ট স্টেশনে আঞ্চলিক খাবার পেতে পারেন তার জন্য ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করা। নতুন দিল্লি-অমৃতসর এবং নতুন দিল্লি-জম্মুতাওয়াই সেকশনে পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- পরিচ্ছন্নতার জন্য রেল বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি।
- সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে হাউজ কিপিং পরিষেবা প্রসারিত করা হবে।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বেড রোল সরবরাহ করতে যন্ত্রচালিত লন্ড্রির সংখ্যা বাড়ানো হবে।
- স্টেশনগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য যন্ত্র বসানো এবং বিভিন্ন ট্রেনেও পরীক্ষামূলকভাবে একই উদ্যোগ।
- স্টেশনগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নামী এবং ইচ্ছুক অ-সরকারি সংগঠন, দাতব্য সংস্থা এবং কর্পোরেট সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে।

নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগ

- সড়ক, ওভারব্রিজ এবং আন্ডারব্রিজ নির্মাণের জন্য ১,৭৮৫ কোটি টাকার সংস্থান।
- কর্মীবিহীন লেভেল ক্রসিংগুলিকে তুলে দিতে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।
- দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমাতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং চালকদের প্রশিক্ষণ।
- সুরক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ধাঁচের কাজ।
- মেন লাইন এবং সাবার্বান কোচে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরজা বন্ধের পাইলট প্রকল্প।
- ৭,০০০ আর.পি.এফ. কনস্টেবলের অতিরিক্ত হিসেবে আরও ৪,০০০ মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ।
- আর.পি.এফ. বাহিনীর হাতে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা। একক মহিলা যাত্রীর জন্য বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা।
- স্টেশনগুলিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা।

টিকিট সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তি

- পরবর্তী প্রজন্মের ই-টিকিটিং-এর ব্যবস্থা।
- ১,২০,০০০ ব্যবহারকারী একই সঙ্গে যাতে অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন সেজন্য প্রতি মিনিটে ৭,২০০টি টিকিট ইস্যুর ব্যবস্থা।
- মুদ্রাভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন চালু।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং অসংরক্ষিত টিকিটের ব্যবস্থা।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগে ভারতীয় রেলের কর্মধারায় পরিবর্তন।
  - ⁂ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কাগজবিহীন রেলের অফিস চালু করা।
  - ⁂ দেশের প্রধান স্টেশন এবং নির্বাচিত কিছু ট্রেনে ওয়াই-ফাই এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা।
  - ⁂ তাৎক্ষণিক ট্রেনের অবস্থান জানা।
  - ⁂ যাত্রীদের জন্য মোবাইলভিত্তিক বার্তা প্রেরণের আগাম ব্যবস্থা।
  - ⁂ মোবাইলভিত্তিক গন্তব্য জানানোর ব্যবস্থা।
  - ⁂ প্রত্যেক স্টেশনে ডিজিটাল সংরক্ষণ তালিকা।
  - ⁂ প্রত্যেক টিকিট কাউন্টারে ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন।
  - ⁂ কম্পিউটারচালিত পার্সেল পরিচালন ব্যবস্থা।
  - ⁂ দেশের গন্তব্যস্থানগুলিতে কর্মরত রেলকর্মীদের সন্তানদের জন্য রেল টেল অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা।
- রেলের অধীনে সারা দেশের সমস্ত জমির মানচিত্র তৈরি।

প্রশিক্ষণ

- টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল উভয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য রেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

● স্নাতক পর্যায়ে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রেলের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচি চালু করার জন্য বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ সংস্থার সঙ্গে চুক্তি।

● সারা দেশে তৃণমূলস্তরে কর্মরত আধিকারিকদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণমূলক পাঠ্যক্রম চালু।

● দ্রুত গতি এবং ভারী ধরনের কাজের মতো বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কর্মী-আধিকারিকদের দেশ এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ট্রেনের গতি

● মুম্বই-আমেদাবাদ সেক্টরে বুলেট ট্রেন প্রবর্তন।

● উচ্চ গতিসম্পন্ন হীরক চতুর্ভুজ রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ। প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

● নয়টি রুটে ট্রেনের গতিবেগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৬০-২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত করা।

● ৩০.০৯.২০১৪ তারিখের পর সারা দেশে সমস্ত পরীক্ষামূলক স্টপেজ তুলে দেওয়া।

● নতুন স্টপেজের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক এবং কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।

২০১৩-১৪-র আর্থিক হিসাবনিকাশ

● ২০১৩-১৪-য় রেল ট্রাফিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবের তুলনায় ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

● রেলে যাত্রী সংখ্যা কমেছে এবং ভাড়াবাবদ আয়ও সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৯৬৮ কোটি টাকা কমেছে।

● রেলের মোট আয় হয়েছে ১,৩৯,৫৫৮ কোটি টাকা যা, সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৯৪২ কোটি টাকা কম। তবে, গত অর্থবর্ষের তুলনায় এই আয় প্রায় ১২.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে।

● সাধারণ কার্যকর ব্যয় এবং পেনশনবাবদ ব্যয় সংশোধিত হিসাবের তুলনায় বেড়েছে।

● সরকারকে ৮,০১০ কোটি টাকার লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে।

● ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে পরিকল্পনাবাবদ রেল নিজস্ব উদ্যোগে ১১,৭১০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে।

২০১৪-১৫-র বাজেট অনুমান

● ১,১০১ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য যা ২০১৩-১৪-র তুলনায় ৫১ মেট্রিক টন বেশি।

● ২ শতাংশ হারে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি।

● মাশুলবাবদ আয় ১,০৫,৭৭০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান।

● যাত্রী ভাড়াবাবদ আয় ৪৪,৬৪৫ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান।

● মোট আয় ১,৬৪,৩৭৪ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১,৪৯,১৭৬ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান।

● পেনশনবাবদ ব্যয় ২৮,৮৫০ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান।

● সরকারকে ৯,১৩৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ দিতে হবে বলে অনুমান।

● কার্যকর অনুপাত ২০১৩-১৪-র তুলনায় ১ শতাংশ উন্নত হয়ে ৯২.৫ শতাংশ গিয়ে পৌঁছবে বলে এবারের বাজেটে অনুমান করা হয়েছে।

২০১৪-১৫-র বার্ষিক পরিকল্পনা

● এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক ৬৫,৪৪৫ কোটি টাকা পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।

✪ বাজেট থেকে প্রাপ্ত মোট অর্থ	—	৩০,১০০ কোটি টাকা
✪ রেল নিরাপত্তা তহবিল	—	২,২০০ কোটি টাকা
✪ অভ্যন্তরীণ সহায়সম্পদ	—	১৫,৩৫০ কোটি টাকা
✪ বাজেট অতিরিক্ত সহায়সম্পদ-বাজার থেকে ঋণ	—	১১,৭৯০ কোটি টাকা
✪ বাজেট অতিরিক্ত সহায়সম্পদ-সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব	—	৬,০০৫ কোটি টাকা

● বাজেট সূত্র থেকে পরিকল্পনাবাবদ বরাদ্দ ৪৭,৬৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের তুলনায় ৯,৩৮৩ কোটি টাকা বেশি। অতিরিক্ত এই অর্থ প্রধানত রেল নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করা হবে।

● চলতি বছরের মধ্যে যে সব প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে সেগুলির জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ দেওয়া হয়েছে।

● নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য দেশের ৩০টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নতুন সমীক্ষা

● ১৮টি নতুন লাইনের সমীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন ও গেজ পরিবর্তনের জন্য ১০টি সমীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন ট্রেন

● পাঁচটি নতুন জনসাধারণ ট্রেন চালু করা হবে।

● পাঁচটি প্রিমিয়াম এবং ছয়টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন চালু করা হবে।
● ২৭টি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হবে।
● আটটি যাত্রী পরিষেবা, পাঁচটি ডেমু পরিষেবা, দুটি মেমু পরিষেবা চালু করা হবে এবং ১১টি ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ করা হবে।

২০১৪-১৫-র সাধারণ বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জ

● পরিবর্তনের জন্য ভোটের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন, দারিদ্রের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। দেশ এখন আর বেকারি, অপর্যাপ্ত ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, পরিকাঠামোর ঘাটতি এবং অমনোযোগী প্রশাসন মেনে নিতে রাজি নয়।
● দেশের অর্থনীতির সামনে ৫ শতাংশের নীচে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এবং দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতির চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে।
● বহু উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান নিম্নগতি, বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।
● ২০১৩-র তুলনায় ২০১৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬ শতাংশ হবে বলে আশা।
● এন.ডি.এ. সরকারের প্রথম বাজেটে তারা দেশকে কোন দিশায় নিয়ে যেতে চায় তার সাধারণ নীতি ঘোষণার ইঙ্গিত রয়েছে।
● আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারকে ৭-৮ শতাংশ অথবা তার ওপরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাজেটে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলিকে এক দীর্ঘ যাত্রাপথের সূচনা বলা যেতে পারে।
● প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়ন কৌশল এবং তার লক্ষ্য 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে।
● উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পুনর্নবীকরণের প্রয়োজনীয়তা।
● কর এবং জাতীয় আয়ের অনুপাতকে নিশ্চিতভাবে উন্নত করতে হবে এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘাটতি এবং মুদ্রাস্ফীতি

● রাজকোষ ঘাটতির হার ২০১১-১২-র ৫.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩-১৪-র ৪.৫ শতাংশ হওয়ার পেছনে প্রধানত ব্যয় হ্রাস রয়েছে। যদিও, আরও বেশি রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে তা হওয়া উচিত ছিল।
● ২০১২-১৩-র চলতি খাতে ঘাটতির হার ৪.৭ শতাংশ থেকে কমে অর্থবর্ষের শেষ পর্যায়ে ১.৭ শতাংশ হওয়ার পেছনে অপ্রয়োজনীয় আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং মোট চাহিদার হ্রাস রয়েছে। চলতি খাতে ঘাটতির ওপরে নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।
● পর পর দু'বছর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমা, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার থমকে যাওয়া, পরোক্ষ করবাবদ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির কম হার, ভরতুকির বোঝা এবং কর খাতে ততটা আয় না বাড়ার মতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজকোষ ঘাটতির হার ৪.১ শতাংশ মধ্যে ধরে রাখার লক্ষ্য পূরণ অত্যন্ত কঠিন কাজ।
● সরকার এই লক্ষ্য পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর্থিক সংহতির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতির হারকে ৩.৬ শতাংশে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।
● পাইকারি মূল্য সূচক ক্রমশ কমলেও মুদ্রাস্ফীতির হার এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।
● কালো টাকার সমস্যা মোকাবিলার বিষয়টিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।
● দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করতে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উদ্যোগ

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

● নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহিত করবে।
● বিমা ক্ষেত্র সহ সম্পূর্ণত ভারতীয় পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সংস্থায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমা বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হবে। বৈদেশিক লগ্নি উৎসাহদান পর্ষদ বা এফ.আই.পি.বি.-এর মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
● ছোট শহরের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের শর্ত হিসেবে বিল্ট-আপ এরিয়ার পরিমাণ ৫০ হাজার স্কোয়ার মিটার থেকে কমিয়ে ২০ হাজার স্কোয়ার মিটার এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ কোটি ডলার থেকে ১ কোটি ডলার করা হবে।
● উৎপাদনকারী সংস্থাকে তাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য খুচরো এবং ই-কমার্স ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হবে।

গ্রামোন্নয়ন

● দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রকল্পভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গ্রামীণ মিশন' চালু করা হবে।
● গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা' নামে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচি চালু হবে।
● প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে ১৪,৩৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ।

● মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তাকরণ আইনের আওতায় আরও বেশি সম্পদসৃজনের জন্য এই প্রকল্পকে কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।
● আজীবিকা প্রকল্পে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৪ শতাংশ সুদের হারে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার কাজ আরও ১০০টি জেলায় প্রসারিত করা হবে।
● দেশের গ্রামীণ যুবকদের উদ্যোগমূলক কাজে উৎসাহিত করতে একটি তহবিলে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● গ্রামীণ আবাসনে সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় আবাসন ব্যাংকে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮ হাজার কোটি টাকা করা হবে।
● দেশের জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচিকে জোরদার করতে 'নীরাঞ্চল' নামে একটি নতুন কর্মসূচি চালু হবে। এর জন্য ২,১৪২ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে।
● উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার মধ্যে অসাম্য দূর করতে অনুন্নত অঞ্চল অনুদান তহবিলকে পুনর্গঠন করা হবে।

প্রবীণ নাগরিক এবং অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রকল্প

● ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২০১৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য বরিষ্ঠ পেনশন বিমা যোজনা কর্মসূচি পুনরায় কার্যকর হবে। এর ফলে, দেশের ৬০ বছর এবং তার বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিকরা সুবিধা পাবেন।
● দেশের প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কীভাবে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, পোস্ট অফিস এবং সেভিংস স্কিমের দাবিবিহীন জমারাশি ব্যবহার করা যায় তা পরীক্ষা করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে।
● সমস্ত কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের গ্রাহক সদস্যদের জন্য ন্যূনতম পেনশন প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করা হবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● এই প্রকল্পে গ্রাহক হওয়ার সর্বোচ্চ বেতনসীমা বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। চলতি বাজেটে এজন্য ২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
● কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (ই.পি.এফ.ও.) তার সমস্ত গ্রাহক সদস্যদের জন্য একটি 'ইউনিফর্ম অ্যাকাউন্ট নম্বর' চালু করবে।
● প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়ক যন্ত্রপাতি কিনতে আর্থিক সহায়তার প্রকল্পকে প্রসারিত করে এতে আধুনিক যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
● ইউনিভার্সাল ইনক্লুসিভ ডিজাইন, মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন এবং প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলা সংক্রান্ত একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।
● সারা দেশে ১৫টি নতুন ব্রেইল প্রেস স্থাপন এবং ১০টি পুরনো ব্রেইল প্রেসের আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
● দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য কাগজের মুদ্রায় ব্রেইল ছাপ দেওয়া হবে।

মহিলা ও শিশুবিকাশ

● জনপরিবহণে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি পাইলট প্রোজেক্টের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● বড় বড় শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কর্মসূচিতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● দিল্লি রাজধানী অঞ্চলে সব জেলায় সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র খোলা হবে।
● 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' যোজনার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতা

● আগামী তিন বছরে দেশের আর্সেনিক, ফ্লুরাইড এবং কীটনাশক দূষণপ্রবণ ২০ হাজার গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।
● ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত পরিবারে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করতে 'সচ্ ভারত অভিযান' নামে একটি কর্মসূচি শুরু হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

● সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।
● নতুন দিল্লির এইম্স-এ এবং চেন্নাইয়ের ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে প্রবীণদের স্বাস্থ্য বিষয়ক দুটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।
● দন্ত চিকিৎসার জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের উচ্চমানের গবেষণা এবং রেফারেল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।
● অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ এবং উত্তরপ্রদেশে পূর্বাঞ্চলে এইম্স ধাঁচের চারটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। এর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● সারা দেশে নতুন ১২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হবে।
● ওষুধ এবং খাদ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণকারী রাজ্য পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে নতুন ওষুধ পরীক্ষা গবেষণাগার স্থাপন করা হবে এবং ৩১টি পুরনো রাজ্য পর্যায়ের গবেষণাগারকে উন্নত করে তোলা হবে।

● গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে ১৫টি আদর্শ গ্রামীণ স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
● আগামী ছয় মাসের মধ্যে দেশের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে মিশন ধাঁচে একটি জাতীয় কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে।

শিক্ষা: বিদ্যালয় শিক্ষা

● দেশের সমস্ত মেয়েদের স্কুলে শৌচাগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে সরকার উদ্যোগ নেবে।
● সর্ব শিক্ষা অভিযানের জন্য ২৮,৬৩৫ কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের ৪,৯৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় মূল্যায়ন কর্মসূচির সূচনা করা হচ্ছে।
● 'পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিউ টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম' প্রকল্পে আরও বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● অনলাইন পাঠ্যক্রম এবং ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

● মধ্যপ্রদেশে 'জয়প্রকাশ নারায়ণ ন্যাশনাল সেন্টার ফর এক্সলেন্স ইন হিউম্যানিটিজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।
● জম্মু, ছত্তিশগড়, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরলে পাঁচটি নতুন আই.আই.টি. স্থাপন করার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা এবং রাজস্থানে পাঁচটি নতুন আই.আই.এম. স্থাপন করা হবে।
● উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ঋণের পদ্ধতি সরলীকরণ করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি

● সারা দেশে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● সুপ্রশাসন সুনিশ্চিত করতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন কর্মসূচির সূচনা করা হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার

● ৬০০টি নতুন এবং পুরনো গোষ্ঠী বেতার কেন্দ্রের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● পুণের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটকে জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অ্যানিমেশন, গেমিং এবং স্পেশাল এফেক্টস-এর জন্য একটি জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
● ২৪ ঘণ্টার ডি. ডি. কিষাণ দূরদর্শনের চ্যানেলের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নগরোন্নয়ন

● আগামী ১০ বছরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে দেশের ৫০০টি পুর অঞ্চলকে পরিকাঠামো এবং পরিষেবা উন্নয়নের জন্য সরকার সাহায্য দেবে।
● পুর এলাকার নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ঋণ তহবিলের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার কোটি টাকা করা হবে।
● লখনউ এবং আমেদাবাদের রেল প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

আবাসন

● সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুবকদের নিজের বাড়ি নির্মাণে উৎসাহিত করতে গৃহ ঋণের ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়া হবে।
● জাতীয় আবাসন ব্যাংকের অধীনে স্বল্প ব্যয়ে আবাসন নির্মাণের জন্য একটি মিশন চালু করা হবে।
● পুর এলাকার দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণির মানুষদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণে ৪ হাজার কোটি টাকার তহবিল গড়া হবে।

কৃষি

● অসম ও ঝাড়খণ্ডে দুটি নতুন কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি প্রযুক্তি পরিকাঠামো তহবিল নামে একটি তহবিলের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থানে দুটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেলেঙ্গনা ও হরিয়ানায় দুটি উদ্যানপালন সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মিশন ধাঁচে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া, সারা দেশে ১০০টি ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষা গবেষণাগার স্থাপনে অতিরিক্ত ৫৬ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১০০ কোটি টাকা দিয়ে একটি জাতীয় তহবিল গড়ে তোলা হবে।
● কৃষিক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
● উন্নত উৎপাদনশীলতা এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিয়ে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে।
● কৃষিপণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কৃষিপণ্য মূল্য স্থিতিশীলতা তহবিল গড়ে তোলা হবে।

● খাদ্য এবং সবজির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের সংশ্লিষ্ট আইনকানুন (এ.পি.এম.সি. অ্যাক্ট) পরিবর্তনে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করবে।
● দেশজ পশু প্রজননের উন্নয়নে এবং মাছ চাষে নীল বিপ্লবের সূচনা করতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● খাদ্যশস্য সংরক্ষণে গুদামজাতকরণের ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

● ভারতের খাদ্য নিগম পুনর্গঠন করা হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
● দেশের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষজনকে স্বল্প মূল্যে গম এবং চাল সরবরাহ করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
● খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে প্রয়োজনে খোলা বাজারে সরকার খাদদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্যোগ নেবে।

শিল্প

● এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিষেবা দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রক তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিতে এক জানালার ই-বিজ কর্মসূচি হাতে নেবে।
● জাতীয় শিল্প করিডর কর্তৃপক্ষ স্থাপনে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● অমৃতসর-কলকাতা শিল্প মাস্টার প্ল্যান দ্রুত সম্পন্ন করতে উদ্যোগ।
● ২০টি নতুন শিল্প ক্লাস্টারসহ বেঙ্গালুরু-মুম্বই অর্থনৈতিক করিডর এবং ভাইজাগ-চেন্নাই করিডরের কাজ শেষ করা হবে।
● রপ্তানি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে একটি রপ্তানি উন্নয়ন মিশন চালু করা হবে।
● শিল্পক্ষেত্র এবং সাধারণ যুবকদের সুবিধার্থে দেশের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্টকে সংশোধন করা হবে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

● রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণের জন্য চলতি অর্থবর্ষে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যগুলির বিভিন্ন জেলার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হবে।
● সীমান্তে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নে ২,২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সীমান্ত অঞ্চলে গ্রামগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নে ৯৯০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● সামুদ্রিক থানা, জেটি এবং নৌকো কেনার জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
● জাতীয় পুলিশ স্মারক তৈরিতে ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

সংস্কৃতি ও পর্যটন

● স্ট্যাচু অফ ইউনিটি (বল্লভভাই প্যাটেল-এর প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ ও) স্থাপনে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
● দেশের নয়টি বিমানবন্দরে ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন বা ই-ভিসার সুবিধা প্রদান করা হবে।
● দেশের পাঁচটি পর্যটন সার্কিট উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● দেশের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রগুলির পুনর্নবীকরণের একটি জাতীয় মিশনে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● জাতীয় ঐতিহ্যের শহরোন্নয়ন যোজনায় ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধগুলির উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।
● সারনাথ, গয়া, বারাণসী, বৌদ্ধ ধর্মীয় তীর্থযাত্রার সার্কিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

অর্থনীতির অবস্থা ও সম্ভাবনা

● ৫ শতাংশের নিম্নগামিতা কাটিয়ে ২০১৪-১৫-তে আর্থিক বিকাশের হার দাঁড়াবে ৫.৪ শতাংশ থেকে ৫.৯ শতাংশ।
● বৃদ্ধির ব্যাপক নিম্নগামিতায় বিশেষ করে ব্যাহত শিল্প ক্ষেত্র।
● অনুকূল বর্ষার কারণে ২০১৩-১৪-তে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ৪.৭ শতাংশ।
● পরিষেবা ক্ষেত্রেও মন্থরতা।

সমস্যা ও অগ্রাধিকার

● মুদ্রাস্ফীতিকে স্থিতিশীল করা, কর ও ব্যয়ের সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোর সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির জন্য ত্রিমুখী সংস্কারের আবশ্যকতা।
● বিক্রয় ও পণ্যের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কৃষকদের ওপর যে বাধানিষেধ রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়ার প্রস্তাব সমীক্ষায়।
● সার এবং খাদ্যপণ্যের মতো উপকরণের ক্ষেত্রে ভরতুকি প্রথার সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা।
● কৃষক ও দরিদ্র পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে এগোনোই সরকারের চূড়ান্ত অভিমুখ হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ব্যয়

● ২০১৩-১৪-র রাজস্ব নীতিতে দুটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য হল প্রথমত, বৃদ্ধির পুনরুজ্জীবন এবং দ্বিতীয়ত, ২০১৩-১৪-এর রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো।

● ২০১৩-১৪-এর বাজেটে লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ এবং সরকারি ব্যয় সংকোচনে সুসাধ্য সীমার মধ্যে ব্যয়ের সরলীকরণ।

● অগ্রগতির মন্দা, বিশ্বব্যাপী অশোধিত তেলের মূল্যস্তরে বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে মন্থরতার ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও ২০১৩-১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

মূল্যস্তর ও মুদ্রানীতি পরিচালনা

● মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার বিশেষ করে, খাদ্যপণ্যের চড়া দামের কারণ কাঠামোগত এবং মরশুমজনিত।

● আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আই.এম.এফ.) পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৪-১৫-তে পণ্যসামগ্রীর দাম না বাড়ার সম্ভাবনা।

● বিদেশি মুদ্রা বাজারে স্থিতি আনার লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাংক জুলাই মাসে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ মানি মার্কেটের নগদ সদৃশতাকে সংকুচিত করেছে।

আর্থিক হস্তক্ষেপ

● ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে সমস্যাদীর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল— পরিকাঠামো, লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্রশিল্প, অসামরিক বিমান পরিবহণ এবং খনন শিল্প।

● সাধারণভাবে শিল্পক্ষেত্র বিশেষ করে, ওই সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ব্যাপক আর্থিক যোগাযোগ রয়েছে।

● ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে নবনিযুক্ত সরকারি কর্মীদের জন্য যে নতুন জাতীয় পেনশন নীতি গৃহীত হয়েছে তা ভারতীয় পেনশন ব্যবস্থায় এক বড় রকমের সংস্কারসাধন।

● পরবর্তী প্রবাহের পরিকাঠামো সাহায্যের জন্য চাই একটি সর্বতোভাবে কার্যকর বন্ড বাজার।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

● ২০১২-১৩ সালের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালে চলতি খাতে ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় ভারতের পরিশোধ স্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

● ভারতে বিদেশি মুদ্রার জমা তহবিল ২০১৩ সালের মার্চ অন্তক হিসাব ২৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪-এর মার্চে পৌঁছেছে ৩০৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

● সুষ্ঠু ঋণ পরিচালনা ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে ভারতের বৈদেশিক ঋণ নাগালের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

● বিশ্ব বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি ২০১২-তে হ্রাস পেয়ে ২.৮ শতাংশ পৌঁছলেও ২০১৩ সালে অগ্রগতির শ্লথতা সত্ত্বেও পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত এনে দিয়েছে।

● বিশ্ব বাণিজ্যে ২০১৩-১৪-তে আমদানির বিপুল হ্রাস ও রপ্তানির মাঝারি বৃদ্ধি ঘটার দরুন ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটা কমে এসে হয়েছে ২৭.৮ শতাংশ।

● ২০১৪-র এপ্রিল-মে মাসে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে ৪২.৪ শতাংশ।

কৃষি ও খাদ্য পরিচালনা

● ২০১৩-১৪-তে খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে।

● উদ্যান পালন ক্ষেত্রে ২০১২-১৩-র বাড়তি উৎপাদন এই প্রথম খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের উৎপাদনকে অতিক্রম করেছে।

● সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় পুলে খাদ্যপণ্যের মজুতভাণ্ডার গত ১ জুন পর্যন্ত হিসেবে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৯.৮৪ মিলিয়ন টন।

● ২০১৩ সালে খাদ্যপণ্যের মোট জোগান বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২২৯.১ মিলিয়ন টন। সেই সঙ্গে ভোজ্যতেলের জোগানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রের ভূমিকা

● মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সর্বশেষ হিসেবে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩-তে শিল্পে মাত্র ১ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে যা ২০১৩-১৪-তে আরও কমে ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি হারে পৌঁছেছে।

পরিষেবাক্ষেত্র

● পরিষেবা জি.ডি.পি.-র ক্ষেত্রে ২০১২ সালে বিশ্বের ১৫টি শীর্ষ দেশের মধ্যে চলতি মূল্যস্তরে জি.ডি.পি.-র নিরিখে ভারতের স্থান ছিল দ্বাদশ।

● ২০০১-২০১২ পর্যন্ত সময়ে ভারত চীনের ঠিক পরেই স্থান পেয়ে পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দ্রুততম বিকাশশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে।

● ২০১৩-১৪ সালে পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ তীব্রভাবে ৩৭.৬ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে পৌঁছেছে ৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

জ্বালানি, পরিকাঠামো ও যোগাযোগ

● ২০১৩-১৪ সালে প্রধান প্রধান শিল্প ও পরিকাঠামো পরিষেবার ক্ষেত্রওয়াড়ি কাজকর্মের পর্যালোচনা করে মিশ্র ফলাফল লক্ষ করা যায়। একদিকে ২০১২-১৩ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ ও সারের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেড়েছে অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে নিম্নমুখী হয়েছে কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট ও শোধনাগারের উৎপাদন। ২০১৩-১৪-তে অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে।

● দ্বাদশ যোজনার প্রথম দুই বছরে কয়লা ক্ষেত্রের কাজকর্মে তেমন কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ২০১২-১৩-র কয়লা উৎপাদন ৫৫৬ মেট্রিক টন থেকে সামান্য বেড়ে ২০১৩-১৪-তে ৫৬৬ মেট্রিক টন হয়েছে।

● জাতীয় সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণের দ্বারা ২০১৪-র মার্চ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে মোট ২১,৭৮৭ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ। অর্থনীতিতে মন্দা সত্ত্বেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ২০১২-১৩-তে ২,৮৪৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে পেরেছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ বার্ষিক সাফল্য। ২০১৩-১৪-তে সম্পন্ন হয়েছে ১,৯০১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ।

● পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বড় সমস্যাগুলি হল—অনুমোদনপ্রাপ্তিতে বিলম্ব, জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের সমস্যা, পরিবেশ সংক্রান্ত অনুমোদনে জটিলতা প্রভৃতি। এগুলির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। প্রকল্প রূপায়ণে বিলম্বই পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়নে সব থেকে বড় অন্তরায়।

সুস্থায়ী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

● গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণ মানুষই এবং এই নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

● সারা বিশ্বে তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য সঠিক প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে না। ১৯৭০-২০০০ সাল পর্যন্ত গ্রিন হাউস নিঃসরণের বার্ষিক মাত্রা ১.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-২০১০ সময়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ২.২ শতাংশ।

● জলবায়ু পরিবর্তন ও সুস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত দুটি নতুন চুক্তি কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন দেশের ওপর প্রবল চাপ আসছে, যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে আগামী বছর।

● ২০১০-২০৩০ সময়সীমায় ভারতের ন্যূন কার্বন কৌশলে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২০১১-এর মূল্যস্তর অনুযায়ী ৮৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মানব উন্নয়ন

● মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে ভারত বিশ্বের ১৮৬টি দেশের মধ্যে ২০১৩ সালে ১৩৬তম স্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান এখনও মানব উন্নয়নের মাঝারি পর্যায়ে রয়েছে।

● দারিদ্র অনুপাত যা কিনা ২০০৪-০৫-এ ছিল ৩৭.২ শতাংশ তা কমে ২০১১-১২-তে হয়েছে ২১.৯ শতাংশ।

● চূড়ান্ত হিসেবে দরিদ্রদের সংখ্যা, যা ২০০৪-০৫ সালে ছিল ৪০ কোটি ৭১ লক্ষ তা ২০১১-১২-তে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ। এক্ষেত্রে বার্ষিক হ্রাসের গড় হিসেব হল ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২-র মধ্যে ২.২ শতাংশ।

● ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার হল মাত্র ০.৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-০৫ সময়সীমায় অগ্রগতির হার ছিল ২.৮ শতাংশ।

কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক

● ২০১৩-১৪-তে রেকর্ড পরিমাণ ২৬৪.৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
● ২০১৩-১৪-তে রেকর্ড পরিমাণ ৩২.৪ মেট্রিক টন তৈলবীজ উৎপাদন।
● ২০১৩-১৪-তে রেকর্ড পরিমাণ ১৯.৬ মেট্রিক টন ডালশস্য উৎপাদন।
● চিনেবাদামের উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি; ২০১৩-১৪-তে ৭৩.১৭ শতাংশ।
● আঙুর, কলা, সাগু, মটরশুঁটি ও পেঁপের উৎপাদনশীলতায় ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানে।
● ২০১৩-১৪-তে খাদ্যশস্যের চাষ এলাকা ৪.৪৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৬.২ মিলিয়ন হেক্টরে।
● ২০১৩-১৪-তে তৈলবীজের চাষ এলাকা ৬.৪২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৮.২ মিলিয়ন হেক্টর।
● কেন্দ্রীয় পুলে গত ১ জুন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের মজুতভাণ্ডার হল ৬৯.৮৪ মিলিয়ন টন।
● ২০১৩-তে খাদ্যশস্যের নিট সরবরাহ ১৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২২৯.১ মিলিয়ন টন।
● ২০১৩ সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের বার্ষিক জোগান বেড়ে হয়েছে ১৮৬.৪ কিলোগ্রাম।
● ২০১৩-১৪-তে কৃষি রপ্তানি বৃদ্ধির হার ৫.১ শতাংশ।
● ২০১৩-১৪-তে সামুদ্রিক প্রাণীর রপ্তানি বৃদ্ধি ৪৫ শতাংশ।
● ২০১২-১৩-তে দুধের রেকর্ড পরিমাণ ১৩২.৪৩ মেট্রিক টন উৎপাদন।
● ২০১২-১৩-তে সমগ্র জি.ডি.পি.-তে গবাদি পশু ক্ষেত্রের অবদান ছিল ৪.১ শতাংশ।
● ২০১৩-১৪-তে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের পরিমাণ ৭ লক্ষ কোটি টাকা।
● ২০১৩-১৪-তে জি.ডি.পি.-তে কৃষি ও সহজাত ক্ষেত্রগুলির অংশ হ্রাস পেয়ে ১৩.৯ শতাংশ।
● ২০০১ সালে কৃষকের সংখ্যা ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে ওই সংখ্যা ১১ কোটি ৪৭ লক্ষ।❑

ঘো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২০ জুন—১৬ জুলাই, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **তিন সাংবাদিকের কারাদণ্ড মিশরে :**

মিশরে ক্ষমতাচ্যুত শাসকগোষ্ঠী মুসলিম ব্রাদারহুডকে সমর্থন করার 'অপরাধে' কাতার কেন্দ্রিক টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরার তিন সাংবাদিককে যথাক্রমে ৭ ও ১০ বছরের কারাদণ্ড দিল কায়রো-র এক আদালত। এঁদের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগও আনা হয়েছে। এই তিন সাংবাদিকের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ার, একজন কানাডার এবং তৃতীয়জন মিশরের নাগরিক। সংবাদে প্রকাশ এঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসলে মিশরের বর্তমান শাসক সেনানায়ক আদেল অল ফতাহ-সিসি স্বৈরাচারকেই দেশ শাসনের হাতিয়ার করে তুলেছেন। তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই ঘৃণ্য হামলার সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ উদ্বিগ্ন।

● **আট হুজি জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড বাংলাদেশে :**

তেরো বছর আগে ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল (বাংলা নববর্ষের দিন) ঢাকার এক মঞ্চে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান চলার সময় পর পর পাঁচটি বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই ১০ জন নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হন। ওই ঘটনায় হুজি জঙ্গিদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। হুজি প্রধান মুফতি আব্দুল হায়ান-সহ ১৪ জন হুজি সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দীর্ঘ ১৩ বছর বিচার চলার পর ২৩ জুন ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন আদালত ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। বাকি ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকারের প্রায় ৮ বছরের রাজত্বে এ পর্যন্ত প্রায় দুশো জনকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান।

● **'জঙ্গি' সংগঠনের তকমা জামাত-কে :**

পাকিস্তানের জামাত-উদ-দাওয়া-কে 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠনের তকমা দিল মার্কিন প্রশাসন। প্রশাসনের ঘোষণা, জামাতের সঙ্গে আর্থিক বা অন্য কোনও যোগাযোগ রাখলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জঙ্গিদের 'সমর্থক' বা 'ঘনিষ্ঠ' বলে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লাহোরের উচ্চ আদালত ও পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত কিন্তু জামাত-উদ-দাওয়াকে 'বৈধ' সংগঠন বলে ছাড়পত্র দিয়েছে। তাই কোন আইনে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী ওই সংগঠনকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

● **খিলাফত সাম্রাজ্য ঘোষণা আই সি সি-র :**

ইরাক ও সিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া', ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাড়ে যা লেভান্ট হিসাবে পরিচিত, খিলাফত সাম্রাজ্য ঘোষণা করল। মধ্যযুগের খলিফা হারুন আল-রশিদের অনুকরণে যে খলিফা সাম্রাজ্য করা হয়েছে তার 'খলিফা' হলেন দলনেতা আবু বকর আল-বাগদাদি। অটোমান তুর্কিদের দীর্ঘস্থায়ী খলিফাতন্ত্রের অবস্থানের ঠিক একশো বছর পর এই নব্য খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস খুবই চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পিছনে জনসমর্থন কতটুকু এ প্রশ্নও উঠেছে।

● **বিচারের কাঠগড়ায় প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি :**

দুর্নীতির তদন্তে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে নিজেকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন এই অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় তোলা হল প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজিকে। অভিযোগে প্রকাশ, ২০০৭ সালে নির্বাচনী প্রচারে সারকোজি তাঁর দলের তহবিল বাড়াতে লিবিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মর গদ্দাফির (গণরোষে নিহত) কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য নিয়েছিলেন। এছাড়াও ফ্রান্সের সবচেয়ে ধনী মহিলা এবং কসমেটিক সংস্থা 'লোরিয়েল'-এর মালকিন লিলিয়ান বেতনকুরের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ নিতেন। এই অভিযোগের সত্যতা জানতে তদন্ত চলছিল ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে। সেই তদন্তে তিনি প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেন। বিচারব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ফ্রান্সে গুরুতর অপরাধ। বিচার চলছে। দোষী সাব্যস্ত হলে ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী সারকোজির দশ বছরের জেল অবধারিত।

● **বোরখা নিষিদ্ধকরণে সায় আদালতের :**

বোরখা পরার ওপর ২০১০ সালেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ফ্রান্স সরকার। এই নিয়ে বহু বিতর্ক হয়। অবশেষে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক ফরাসি তরুণী সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ইউরোপের মানবাধিকার আদালতে মামলা করেন। সেই মামলার রায়ে আদালত জানায়, নিরাপত্তা ও সামাজিক যোগাযোগ, দু'টি দিক থেকেই মহিলাদের বোরখা পরা সমস্যাজনক। অতএব ফ্রান্স সরকারের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে আইনসংগত। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দেয় ফ্রান্সের সংবিধান। কিন্তু সে পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বোরখা নামক আবরণ।

● **আফগানিস্তানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ :**

বিরোধী দল তো বটেই, এমনকী দেশের জনসাধারণের বড় একটা অংশকে অবাক করে দিয়ে প্রায় ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন আশরাফ ঘানি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লা-আবদুল্লা পান ৪৩.৫৬ শতাংশ ভোট। এটি দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের ফলাফল। অথচ প্রথম দফার নির্বাচনে এই আশরাফ মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। আর আবদুল্লা-

আবদুল্লা পেয়েছিলেন ৪৪ শতাংশ ভোট। আফগান সংবিধান অনুযায়ী কোনও প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে দ্বিতীয় দফায় ভোট নেওয়া হয়। সেই দ্বিতীয় দফায় আশরাফ এক লাফে ৫৬.৮৮ শতাংশ ভোট পেয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় দেখা দিয়েছে। আবদুল্লা-আবদুল্লা সরাসরি ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে দ্বিতীয় দফার গণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে 'বিজয়ী' বলেও ঘোষণা করেছেন। ফলে পাঠান ভূমে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে।

● তালিবান বিরোধী অভিযানে আশ্রয়হীন আট লাখ পাক নাগরিক :

পাকিস্তানের অদিবাসী অধ্যুষিত উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালিবান বিদ্রোহীদের দমনে সেনা অভিযান কার্যত তুঙ্গে। আকাশ পথে এবং স্থলে লাগাতার আক্রমণ শাসানো হচ্ছে। বেপরোয়া নির্বিচার ওই আক্রমণে তালিবানি তৎপরতা কতটা প্রতিরোধ করা গেছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ওই অঞ্চলের সাধারণ নিরীহ নাগরিক জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে তাঁরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছেন বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বহু মানুষ। এমন বাস্তুচ্যুত নাগরিকের সংখ্যা এই মুহূর্তে ৮ লাখ বলে সরকারি সূত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের দেশেই তাঁরা আশ্রয়হীন।

● দারিদ্রের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ব্রিটেনে :

ব্রিটেনে গত তিন দশকে দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে বলে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষা চালিয়েছে ব্রিটেনের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও দু'টি গবেষণা সংস্থা। যৌথ এই সমীক্ষায় প্রকাশ—জীবনধারণের খরচ এত বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পূর্ণ সময়ের চাকরি করা মানুষও দারিদ্রের কবলে পড়েছেন। এই মুহূর্তে ব্রিটেনে, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম অত্যাবশ্যক পণ্য সংগ্রহ করতে না পারা মানুষের সংখ্যা ৩৩ শতাংশ বা ৮৭ লক্ষ। ১৯৮৩ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ১৪ শতাংশ বা ৩০ লক্ষ। সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পরিবার যথেষ্ট খাবার দিতে পারে না, দেশে এমন শিশুর সংখ্যা ৫ লক্ষ। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকা মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। দারিদ্রের কারণে সাধারণ সামাজিক কাজকর্মে যোগ দিতে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

● গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি বর্বরতা :

প্যালেস্তাইনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি আগ্রাসন মানব সভ্যতার সকল রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করে চলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের সরকারি বাহিনী লাগাতার একতরফা আক্রমণ (আকাশ ও স্থলপথে) চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে প্যালেস্তিনীয় নাগরিক, যার মধ্যে বেশির ভাগই শিশু। সারা বিশ্ব ইজরায়েলি বর্বরতাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। অবিলম্বে গাজা ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ বন্ধ করার জন্য সারা বিশ্ব—আবেদন, নিবেদন, এমনকী হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েলের ঘাতক বাহিনী সবকিছুকে উপেক্ষা করে গাজা উপত্যকাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইজরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে গেছে। আহত দেড় হাজার। দু'হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গেছে।

এই দেশ

● 'খাদ্য সুরক্ষা' আইন প্রণয়নের মেয়াদ বৃদ্ধি :

রাজ্যগুলিকে 'খাদ্য সুরক্ষা' আইন চালু করার সময়সীমা ৪ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন দিল্লিতে খাদ্য মন্ত্রকের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। কথা ছিল, ৪ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যকে এই আইন চালু করতে হবে। কিন্তু ২৬ জুন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৫টি রাজ্য, যথাক্রমে হরিয়ানা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও ছত্তীশগড় 'খাদ্য সুরক্ষা' আইন পুরোপুরি চালু করেছে। আর আংশিকভাবে চালু করেছে দিল্লি, হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও চণ্ডীগড়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত-সহ বাকি ১৯টি রাজ্য এখনও পর্যন্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে আইনটি চালু করার মেয়াদ তিন মাস বাড়িয়ে দেওয়া হল বলে জানান কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান।

● সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারপতি নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক :

শীর্ষ আদালতে বিচারপতি পদে দেশের প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল গোপাল সুব্রহ্মণ্যমের নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিদায়ী ইউপিএ সরকারের শেষ পর্বে সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতি হিসাবে চার জনের নাম সুপারিশ করেছিল প্রধান বিচারপতি আর এম লোদার নেতৃত্বাধীন 'কলেজিয়াম'। এই চারজন হলেন, কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অরুণ মিশ্র, ওড়িশা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি আদর্শ গয়াল ও দুই আইনজীবী রোহিংটন নরিম্যান এবং গোপাল সুব্রহ্মণ্যম। চার জনের কারও নাম নিয়েই আপত্তি তোলেনি আগের সরকার। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে সুব্রহ্মণ্যমের নাম নিয়ে আপত্তি তোলে। এই নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়। অবশেষে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়ার অভিযোগ তুলে বিচারপতির সুপারিশ তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিতে বলেন প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল গোপাল সুব্রহ্মণ্যম।

● 'ফতোয়া' অবৈধ ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের :

শরিয়তি আদালতের ফতোয়া বা নির্দেশ কাউকে মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা ওই আদালতের নেই বলে রায় দিল শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, শরিয়তি আদালতের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন দিল্লির জনৈক কৌঁসুলি। সেই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, শরিয়তি আদালত অনেক সময়েই সেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয়। সেই রায় অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তির মানবাধিকারের বিরোধী। এমনকী, অনেক সময়ে তাতে ওই ব্যক্তিকে শাস্তিও দেওয়া হয়। শরিয়তি

আদালতের ফতোয়া বা নির্দেশের কোনও আইনি বৈধতা নেই বলে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে।

● **সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা :**

হেগ শহরের আন্তর্জাতিক আদালতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ মিটে গেল। আন্তর্জাতিক আদালতের দেওয়া মীমাংসাসূত্র অনুযায়ী, এতদিন পর্যন্ত অনির্ধারিত ২৫ হাজার কিলোমিটার এলাকায় প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার কিমি সমুদ্রের অধিকার পেল বাংলাদেশ। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ-সহ বাকি অংশ থাকছে ভারতের। আদালতের এই রায়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ঘুচে গিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে ঢাকা ও দিল্লি। উল্লেখ্য, ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের তলদেশে গ্যাসের অস্তিত্ব মেলার পরেই তার অধিকার নিয়ে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়। ১৯৭১-এর পরে বসিরহাট-সাতক্ষীরায় হাড়িয়াভাঙা নদীর মোহনায় তালপট্টি নামে একটি দ্বীপ গজিয়ে ওঠার পরে দু'দেশই তাকে নিজের বলে দাবি করে। বিরোধ মীমাংসার জন্য হেগ-এ আন্তর্জাতিক আদালতের দারস্থ হয় বাংলাদেশ।

● **দেশে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক :**

রাষ্ট্রসংঘের 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল'-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার সারা বিশ্বে সবথেকে বেশি। 'জন্মের আগেই মৃত্যু'-র সংখ্যাও কম নয়। আর প্রসূতি মৃত্যুর হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ২০১৫ সালের মধ্যে এই পরিস্থিতির উন্নতি না করতে পারলে মানব সম্পদের নিরিখে ভারত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে বলে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ্ :**

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন অমিত শাহ্। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র একান্ত অনুগত অমিত শাহ্ এক সময় গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ইশরাত জাহান, তুলসীরাম প্রজাপতি ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন তিনি। সেই মামলা এখনও চলেছে। এমন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিজেপি-র সভাপতি পদে বসিয়ে দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

● **রেল এবং সাধারণ বাজেট সংক্ষেপে :**

বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (এনডিএ) সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেট পেশ করল যথাক্রমে ৭ এবং ৯ জুলাই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বারের রেল বাজেটে 'গুচ্ছের প্রকল্প ঘোষণার চিরাচরিত রীতি থেকে সরে এসে নতুন দিশা দেখানো হয়েছে'। যাত্রী পরিষেবা এবং রেল সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে সাধারণ বাজেটে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও বিলগ্নীকরণ বৃদ্ধির পাশাপাশি 'সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া'র চেষ্টা করা হয়েছে। বাজেটে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করা, কিষাণ বিকাশপত্র ফিরিয়ে আনা, রাজকোষ ঘাটতি ৪.১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.৬ শতাংশ করা, বিমা, প্রতিরক্ষায় প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি, বিলগ্নীকরণ, পণ্য পরিষেবা কর চালু, নারী নিরাপত্তায় ১৫০ কোটি টাকা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি গড়তে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ-সহ একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

● **'ব্রিকস' শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা :**

ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে আয়োজিত পাঁচ দেশীয় গোষ্ঠী 'ব্রিকসে'র (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে চীনের রাষ্ট্রপতি ঝি জিনপিনের সঙ্গে আলোচনায় সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে বাণিজ্য প্রসারের প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পর রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হন তিনি। দু'দিনের সম্মেলনে শেষ দিনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, মহাকাশ গবেষণা, বাণিজ্য বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে দু'দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। সম্মেলন শেষে সম্মিলিত ঘোষণা পত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পশ্চিমি দুনিয়া, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খর্ব করতে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (IMF)-এর বিকল্প হিসাবে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB) গঠনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোরদার সওয়াল করেন। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, আদর্শগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, কোনও কারণেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা হবে না।

এই রাজ্য

● **রাজ্যের ২০তম জেলা আলিপুরদুয়ার :**

জলপাইগুড়ি জেলাকে দু'ভাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। একটি জলপাইগুড়ি। অন্যটি আলিপুরদুয়ার। ফলে রাজ্যে মোট জেলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০। জলপাইগুড়ি সদর আর মালবাজার মহকুমা নিয়ে হল জলপাইগুড়ি জেলা। আর সাবেক আলিপুরদুয়ার মহকুমা গেল আলিপুরদুয়ার জেলায়। জেলা ভাগের পর জলপাইগুড়ির লোকসংখ্যা দাঁড়াল ২১.৫৭ লাখ। আর আলিপুরদুয়ারের ১৪.৭০ লাখ।

● **শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্রে তৃতীয় লিঙ্গকে স্বীকৃতি :**

বৃহন্নলা ও রূপান্তরকামীদের 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসাবে মান্যতা দিতে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এল সিধো-কানহো-বিরসা-বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে কর্তৃপক্ষ তাঁদের পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে 'তৃতীয় লিঙ্গ' প্রার্থীদেরও আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আবেদনপত্রেও পুরুষ, মহিলা, 'তৃতীয় লিঙ্গ', কোনও একটিতে টিক

দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তারাই এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রথম।

● **রাজ্যে প্রথম ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা :**

রাজ্যে সংখ্যালঘু শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। নদীয়া জেলার পানিনালায় রাজ্যের প্রথম ইংরেজি মাধ্যম সরকারি মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠন শুরু হল ২৩ জুন। ২০১৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই স্কুলের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার যাত্রা শুরু হল।

● **বৃত্তিমূলক শিক্ষার হাল বদল :**

বৃত্তিমূলক শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এতদিন ধরে চালু পাঠ্যক্রম সরিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করা হল। শিক্ষকদের নতুন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যে সব নতুন কোর্স চালু হল তার মধ্যে রয়েছে—(১) ক্যামেরা মেরামতি, (২) রত্ন ও অলংকার শিল্প, (৩) ট্রাভেল ট্যুরিজম অ্যান্ড গাইড, (৪) আর্ট অ্যান্ড ডিরেকশন, (৫) অপারেশন থিয়েটারের কর্মী প্রশিক্ষণ-সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক কোর্স। পাশাপাশি যে সব কোর্সগুলি ঢেলে সাজানো হচ্ছে, সেগুলি হল—(১) ইন্টেরিয়র ডিজাইন কোর্স, (২) সিভিল অ্যান্ড মেইনটেনান্স কোর্স, (৩) অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে প্রায় ৩০০০ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিক্ষকের সংখ্যা ২০,০০০। ছাত্র-ছাত্রী ২ লাখ। প্রতি বছর রাজ্য সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাবদ ১৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করে।

● **পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী :**

এম কে নারায়ণন পদত্যাগ করার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। বিজেপি-র এই প্রবীণ নেতা এক সময় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। পেশায় আইনজীবী কেশরীনাথ ১৯৭৭-এ উত্তরপ্রদেশে জনতা পার্টি সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। পাঁচ বার বিধায়ক হন। তিন বার বিধানসভার স্পিকার। কাব্যচর্চাও করেন। হিন্দিতে তাঁর দুটি কবিতার বই আছে। এছাড়াও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন নিয়ে ইংরেজিতে তাঁর লেখা বই যথেষ্ট সমাদর কুড়িয়েছে।

অর্থনীতি

● **প্রথম সারির শিল্পসংস্থার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ :**

দেশের প্রথম সারির ৫০০টি শিল্পসংস্থার মধ্যে স্থান পেল রাজ্যের ৩৩টি সংস্থা। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থা 'ডান অ্যান্ড ব্রাডস্ট্রিট'-এর এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এই তালিকায় রয়েছে এলাহাবাদ ব্যাংক, টাটা গ্লোবাল বেভারেজেস, ম্যাগমা ফিনকর্প, বার্জার পেন্টস ইত্যাদি। দেশের মোট রপ্তানির তিরিশ শতাংশই হয় ওই ৫০০টি সংস্থার মাধ্যমে।

● **ওয়ালমার্টের অনলাইন ব্যবসা শুরু :**

ভারতে ওয়ালমার্টের অনলাইন পাইকারি ব্যবসা চালু হয়ে গেল। প্রাথমিকভাবে হায়দরাবাদে এবং লখনউয়ে 'বেস্টপ্রাইসহোলসেল ডটকোডটইন' ওয়েবসাইট খোলা হল। এই দুই 'ডিজিটাল স্টোর' পাইকারি মডেলে ই-কমার্স ব্যবসায় শুধুমাত্র নথিভুক্ত ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রি করবে। কোনও খুচরো ক্রেতাকে পণ্য বিক্রি করা হবে না। উল্লেখ্য, ভারতে ওয়ালমার্টের ২০টি পাইকারি পণ্যের দোকান (বেস্টপ্রাইস) রয়েছে। আপাতত দুটিতে চালু করা হল অনলাইন ব্যবসা। আগামী ৬ মাস ব্যবসার সাফল্য পরীক্ষা করে বাকি ১৮টি দোকানে অনলাইন ব্যবসার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

● **রিলায়্যান্স মিডিয়া ও প্রাইম ফোকাসের সংযুক্তি :**

বিশ্ব জুড়ে বিনোদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রিলায়্যান্স মিডিয়া ওয়ার্কস মিশে যাচ্ছে প্রাইম ফোকাসের সঙ্গে। এর ফলে তৈরি হবে ১৮০০ কোটি টাকার একটি সংস্থা, যা বিনোদন শিল্পের দুনিয়ায় বৃহত্তম সংস্থার তকমা পাবে বলে যৌথ বিবৃতিতে দাবি করল দুটি সংস্থার কর্তারা।

● **পরিকাঠামো শিল্পে ব্রিটিশ ঋণ :**

ভারতে পরিকাঠামো শিল্পে ১০০ কোটি পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ১০০০ কোটি টাকা) ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ব্রিটিশ সরকার। ডেভিড ক্যামেরন সরকারের তরফে এই ঘোষণা করেন ভারত সফররত সে দেশের অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবোর্ন। কেবলমাত্র একটি শিল্পে এত বিপুল পরিমাণ ঋণ এর আগে বরাদ্দ করা হয়নি বলে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে।

● **'রিলায়েন্স'-কে জরিমানা :**

কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার 'ডি-৬' ব্লকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম পরিমাণে গ্যাস উৎপাদন করার জন্য মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন 'রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজে'র ওপর আরও ৫৭.৯০ কোটি মার্কিন ডলার জরিমানা করল কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, ২০১০-এর ১ এপ্রিল থেকে পর পর চার বছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদন করেনি রিলায়েন্স সংস্থা। এই কারণে সর্বশেষ এই জরিমানা ধরে মোট ২৩৭.৬ কোটি মার্কিন ডলার জরিমানা দিতে হবে তাদের।

● **ওষুধের দর ফের বেঁধে দেওয়া হল :**

ভারতে ফের ১০৮টি ওষুধের দামের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিল ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (NPPA)। তবে এগুলি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় নেই। এর মধ্যে রয়েছে এইচ আই ভি, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ওষুধ। দর কমিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালে আনাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

● **পরিকাঠামোয় উৎসাহ :**

পরিকাঠামো ও তুলনায় কম দামের বাড়ি তৈরিতে ঋণ জোগানোর উৎসাহ দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলিকে সুবিধা দিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। জানাল, ওই প্রয়োজনে ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছেড়ে টাকা তুললে, তা সি আর আর ও এস এল আর নিয়মের বাইরে থাকবে।

● **'ব্রিকস' ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত :**

ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে আয়োজিত পাঁচ দেশীয় (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) 'ব্রিকস' গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতারা 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' (NDB) গঠনের সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করলেন। ব্যাংকের সদর দপ্তর হবে চীনের সাংহাইতে। প্রথম ৬ বছর ব্যাংকের সভাপতিত্ব করবে ভারত। চালু হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। এন ডি বি-র দুটি পৃথক অর্থভাণ্ডার থাকবে, যার প্রতিটির পরিমাণ হবে ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **পরিবেশ দূষণ নির্ণয়ে 'নাসা'-র নতুন উপগ্রহ :**

বায়ুমণ্ডলে দূষণের পরিমাণ মাপতে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা' (ন্যাশনাল এরোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) মহাশূন্যে এক নতুন উপগ্রহ পাঠাল। উপগ্রহের নাম 'কার্বন অবজারভেটরি-২'। এর আগে ২০০৯ এবং ২০১১ সালে এই একই উদ্দেশ্যে দু'দুটি উপগ্রহ পাঠিয়েছিল 'নাসা'। কিন্তু দু'বারই কক্ষচ্যুত হয় কৃত্রিম উপগ্রহ দুটি। কিন্তু এবার কোনও বিপত্তি ঘটেনি। ২ জুলাই গভীর রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যান্ডেনবার্গ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণের ৫৬ মিনিট পরে দ্বিতীয় স্তরের রকেট থেকে অত্যন্ত মসৃণভাবে উপগ্রহটি পৃথক হয়ে নিজস্ব কক্ষে ঘুরতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী।

● **ধ্বংসের মুখে প্রবাল প্রাচীর :**

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন প্রাচীর আগামী দু'দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে ব্রিটেনের সমুদ্রবিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির এই আশ্চর্য সম্পদ ধ্বংস হলে সমূহ বিপদ। বিশদ সমীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ১৯৭০ সালে এই প্রবাল প্রাচীরের আয়তন যতটা ছিল, এই মুহূর্তে তার ৫০ শতাংশও আর নেই।

এই বিপর্যয়ের কারণ কী? ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচারের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে বেহিসেবি ও অতিরিক্ত মাছ ধরার জন্যই এমনটা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ১৯৮০ সাল নাগাদ পানামা থেকে এক ধরনের রোগের জীবাণু এই অঞ্চলে আসে। ওই জীবাণুর প্রভাবে সমগ্র এলাকার সমুদ্র শামুক বিনষ্ট হয়। পরে মৎস্যজীবীদের হাতে ভীষণভাবে কমে যায় প্যারট মাছের সংখ্যাও। ওই দুই সামুদ্রিক প্রাণীর প্রধান খাদ্যই ছিল প্রবাল প্রাচীরের ওপর জন্মানো এক ধরনের শৈবাল। দুই খাদকের সংখ্যায় ভয়াবহ অবনতি হওয়ায় পরের তিন দশকে ওই এলাকার প্রবাল প্রাচীর ছেয়ে গেছে খুনে শৈবালে। সেই শৈবালের প্রভাবে ক্রমশ মরতে বসেছে প্রবাল প্রাচীর। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই এলাকায় সমুদ্র শামুক ও প্যারট মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রবাল প্রাচীরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

● **চাঁদে অবতরণের ৪৫ বছর**

১৬ জুলাই মানুষের চাঁদে প্রথম অবতরণে ৪৫ বছর পূর্তি হল। ওই ঐতিহাসিক অভিযান স্মরণে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন সে দিনের চন্দ্রাভিযানের অন্যতম সদস্য এডুইন অলড্রিন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবের সাহায্যে চালু করলেন 'অ্যাপোলো ৪৫'। এতে রয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানী এবং মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা'-র শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের সাক্ষাৎকার। ট্যুইটার এবং ফেসবুকে অলড্রিনের এই উদ্যোগ দারুণ সাড়া ফেলেছে। অলড্রিনের আশা তাঁর এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের ১৬ জুলাই স্যাটার্ন রকেটে (অ্যাপোলো-১১) চড়ে চাঁদে পাড়ি দিয়েছিলেন নিল আর্মস্ট্রং, এডুইন (বাজ) অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্স।

খেলার জগৎ

● **আইসিসি-র চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন :**

দুর্নীতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-এর প্রধানের পদ থেকে অপসারিত হলেও নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র চেয়ারম্যান হয়ে বসলেন। এর জন্য সংবিধান পর্যন্ত বদল করতে হয়েছে। তাই শুরুতে সামান্য অনিশ্চয়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মেলবোর্নে আয়োজিত আইসিসি-র বৈঠকে বিনা বাধায় শ্রীনিবাসন চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন।

● **ফিফা-র শাস্তি সুয়ারেজ-কে :**

২৫ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলে গ্রুপ লিগ ম্যাচে উরুগুয়ের স্ট্রাইকার লুই সুয়ারেজ ইতালির ডিফেন্ডার জিওর্জিও চিয়েলিনি-র কাঁধে কামড়ে দেন। এই মারাত্মক অপরাধে ফুটবলের বিশ্ব নিয়ামক সংস্থা ফিফা সুয়ারেজকে ৯ মাসের নির্বাসন, ৪ মাস ফুটবল সংক্রান্ত সব কার্যকলাপ থেকে বাইরে এবং ৬৬ হাজার পাউন্ড জরিমানা করল।

● **সুপারসিরিজ খেতাব সাইনার :**

সিডনি-তে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া ওপেন সুপার সিরিজ ব্যাডমিন্টন খেতাব জিতলেন সাইনা নেহওয়াল। ফাইনালে তিনি হারালেন স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনকে (২১-১৮, ২১-১১)। দু'বছর পর এত বড় সাফল্য পেলেন সাইনা। এ বছরই ইন্ডিয়ান ওপেন গ্রাঁপ্রি জিতলেও, সুপার সিরিজে শেষ বার চ্যাম্পিয়ন হন ডেনমার্কে ২০১২ সালে। সে বছরই অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পান তিনি।

● **উইম্বলডন টেনিস খেতাব কিভিতোভা ও জোকোভিচের :**

লন্ডনে উইম্বলডন টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন চেক প্রজাতন্ত্রের প্রেত্রা কিভিতোভা। ফাইনালে তিনি অনায়াসে ৬-৩, ৬-০ সেটে হারান কানাডার ইউজেনি বুশার্ড-কে। কিভিতোভা এই নিয়ে দু'বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন।

অন্যদিকে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে তিনি হারান সতেরোটি গ্রান্ডস্লাম জয়ী সুইৎজারল্যান্ডের রজার ফেডেরারকে (৬-৭, ৬-৪, ৭-৬, ৫-৭, ৬-৪)।

● **ফুটবলে বিশ্বজয়ী জার্মানি :**

ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো-র মারাকানা স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে আর্জেন্তিনা-কে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০তম বিশ্ব ফুটবল

খেতাব জিতে নিল জার্মানি। জার্মানির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মারিও গোৎসে। এই নিয়ে চারবার বিশ্বজয়ী হল জার্মানি। তবে এর আগে ১৯৫৪, ১৯৭৪ ও ১৯৯০ সালে বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল পশ্চিম জার্মানি। সেই হিসাবে অখণ্ড জার্মানির এটাই প্রথম বিশ্বকাপ জয়।

● **বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় :**

এ বারের বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় হিসাবে 'গোল্ডেন বল' পেলেন আর্জেন্তিনার লিওনেল মেসি। সেরা গোলরক্ষক হিসাবে 'গোল্ডেন গ্লাভস' জার্মানির ম্যানুয়েল নয়্যার আর 'গোল্ডেন বুট' হামেস রদ্রিগেজ (কলম্বিয়া)।

● **টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় জয়বর্ধনের :**

চলতি মরশুমে দেশের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানালেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক ও তারকা ব্যাটস্‌ম্যান মাহেলা জয়বর্ধনে। এ পর্যন্ত তিনি ১৪৫টি টেস্ট খেলে ২৪৪ ইনিংসে ৩৩টি সেঞ্চুরি সহ ১১৪৯৩ রান করেছেন। সর্বোচ্চ ৩৭৪ রান। গড় ৫১.১৮।

বিবিধ সংবাদ

● **আখৌড়ির নামে কুমেরু শৃঙ্গ :**

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী আখৌড়ি সিন্‌হা-র নামে কুমেরুর এক পাহাড়ের নামকরণ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিকস ও সেল বায়োলজি-র অধ্যাপক আখৌড়ি সিন্‌হা ১৯৭১ ও ৭৪ সালে অ্যান্টার্কটিকা (কুমেরু) অভিযানের সদস্য ছিলেন। সদস্য হিসাবে তিনি এই অঞ্চলের বেলিংহাউসেন এবং অ্যামুন্ডসেন সমুদ্রের বরফখণ্ডে সিল, তিমি ও পাখি সুমারির কাজে অংশ নেন। এই বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে মার্কিন 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অ্যান্ড অ্যাডভাইসারি কমিটি অন অ্যান্টার্কটিকা' আখৌড়ি নামে কুমেরুর একটি পর্বতের (৯৯০ মিটার উঁচু) নামকরণ করে 'মাউন্ট সিন্‌হা'। উল্লেখ্য, চার দশক আগে কুমেরুতে অধ্যাপক সিন্‌হা-র কাজ আজও আবহাওয়া বদল ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত উদ্যোগে দিক নির্দেশ করে চলেছে।

● **সাহিত্যবিদ শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রয়াত :**

বিশিষ্ট লেখক ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু (৮৫) প্রয়াত হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চা, এবং ক্রিকেট নিয়ে রম্য ভঙ্গিতে বই লিখে তিনি পাঠক মহলে নিজস্ব জায়গা করে নেন। তাঁর লেখা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (সাত খণ্ড) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। ৫০টিরও বেশি বই, অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

● **ব্রিটিশ সংসদে গান্ধী মূর্তি :**

ব্রিটেনের সংসদ ভবনের সামনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-র মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবোর্ন। দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন যে মানুষটি, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬ দশক পেরিয়ে সেই মানুষটিকেই সম্মান জানাতে উদ্যোগী হল ব্রিটিশ সরকার। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের সংসদ ভবনের উলটোদিকে ঐতিহাসিক 'পার্লামেন্ট স্কোয়ারে' নেলসন ম্যান্ডেলা, আব্রাহাম লিঙ্কন-সহ মোট ১০ জন বরেণ্য আন্তর্জাতিক নেতার পাশেই থাকছেন একদা ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুশূল মহাত্মা গান্ধী।

● **জোহরা সহগল প্রয়াত :**

কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী জোহরা সহগল ৯ জুলাই প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। নাচ এবং অভিনয়ে তাঁর সহজাত দক্ষতা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও সমান সমাদর পেয়েছে। প্রবাদপ্রতিম নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের দলে যোগ দেন ১৯৩৫ সালে। সেই হিসাবে নৃত্যশিল্পীর রূপেই তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। এরপর তাঁকে দেখা যায় রুপালি পর্দায় চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে। হাল আমলের প্রচুর হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'চিনি কম', 'বীর জারা', 'দিল সে', 'হাম দিল দে চুকে সনম', 'দিল্লগি' ইত্যাদি। জোহরা ১৯৯৮ সালে 'পদ্মশ্রী' এবং ২০১০ সালে 'পদ্মবিভূষণ' পান।

● **দিলীপকুমারের ভিটেকে ঐতিহ্যের তকমা পাকিস্তানে :**

পেশোয়ারে, কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারের পৈতৃক ভিটেটিকে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী ভবন হিসাবে ঘোষণা করল পাকিস্তান সরকার। দিলীপকুমারের জনপ্রিয়তা এদেশের মতো পাকিস্তানেও প্রবল। ফলে তাঁকে সম্মান দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

● **নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গর্ডিমার প্রয়াত :**

দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল পুরস্কার জয়ী কথাশিল্পী নাদিন গর্ডিমার (৯১) প্রয়াত হলেন। ঔপনিবেশিক দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গর্ডিমারের কলম ছিল ক্ষুরধার। নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর একাধিক উপন্যাস। 'দ্য কনসার্ভেশনিস্ট' উপন্যাসের জন্য পান 'বুকার' (১৯৭৪)। সাহিত্যে নোবেল পান ১৯৯১ সালে।

● **সম্মানিত শাহরুখ খান :**

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'নাইট অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার' পেলেন বিশিষ্ট অভিনেতা শাহরুখ খান। বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র প্রসারে তাঁর স্মরণীয় অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করে ফ্রান্স সরকার।

● **রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দময়ন্তী-কে :**

পশ্চিমবঙ্গের 'ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট' (সিআইডি)-এর ডিআইজি দময়ন্তী সেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা দময়ন্তীর অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দময়ন্তীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প

মলয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের ৬১টি শিল্প এবং স্বনিযুক্তি পেশাকে অসংগঠিতক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪৯টি অংসগঠিত শিল্প এবং ১২টি স্বনিযুক্তি প্রকল্প। নির্মাণ, পরিবহণ, এমনকী বিড়ি শ্রমিকরাও এই অসংগঠিত শ্রমিকদের আওতায় মধ্যে পড়েন যাঁদের আয় খুবই কম। শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে এঁরা বহুক্ষেত্রেই বঞ্চিত। অথচ কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এঁরাই প্রতি শতকরা ৯৪ জন। কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অসংগঠিতক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে ভবিষ্যনিধি প্রকল্প বা State Assisted Scheme of Provident Fund for Un-organized Workers (SASPFUW) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাসপফাও (SASPFUW) প্রকল্প

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে অসংগঠিতক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প বা State Assisted Scheme of Provident Fund for Un-organized Workers (SASPFUW) চালু হয়। এই ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে অসংগঠিত শ্রমিক প্রতি মাসে ২৫ টাকা হারে প্রতি অর্থ বছরে সর্বাধিক ৩০০ টাকা পর্যন্ত জমা দেন। আর রাজ্য সরকার মাসিক ৩০ টাকা হারে এবং বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে (বর্তমানে ৮.৮ শতাংশ) সুদ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে থাকেন। মেয়াদ শেষে শ্রমিক বা তার নমিনি সমস্ত টাকা ফেরত পেয়ে থাকেন।

উপভোক্তা কারা

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের যে ৬১টি শিল্প এবং স্বনিযুক্তি পেশাকে অসংগঠিতক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে তার মধ্যে কোনও না কোনও পেশায় কর্মরত আছেন এমন, যাঁদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে এবং পরিবারের মাসিক গড় আয় ৬,৫০০ টাকার কম, এরা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি এবং বিবিধ আইন ১৯৯২ (E.P.F. & M.P. Act-1952)-এর আওতাভুক্ত শ্রমিকরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

আবেদন করার পদ্ধতি

এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফর্মে (১নং নিদর্শ) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র সমস্ত শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র অথবা উপ-কমিশনার বা সহ-কমিশনারের অফিস থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্লক অফিসে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক অথবা পৌর এলাকায় সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অফিসে নিযুক্ত ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে চার কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি দেওয়া বাধ্যতামূলক। এর সঙ্গে নাম নথিভুক্তকরণের জন্য ২৫ টাকা ফি জমা দিতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে উপভোক্তার যোগ্যতা সংক্রান্ত শংসাপত্র দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পৌরসভার কমিশনার বা কাউন্সিলার জেলা পরিষদের সদস্য বিধায়ক সাংসদ অথবা বেতনভোগী শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার কাছ থেকে এই শংসাপত্র নেওয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ কোথায় করতে হবে

পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লকে অবস্থিত শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র (Labour Welfare Fecilitation Centre) পৌরসভা এলাকায় সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র বা উপ-শ্রম কমিশনার বা সহ-শ্রম কমিশনারের অফিসে যোগাযোগ করা যায়। আর কলকাতা পৌরসভার ক্ষেত্রে ৬নং চার্চ লেন (৪র্থ তল) কলকাতা-৭০০ ০০১-এ শ্রম কমিশনারের অফিসে অথবা কলকাতায় আঞ্চলিক শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

উপভোক্তার বয়স নির্ধারণ

আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের (ফর্ম-১) ক্রমিক নং-৩-এ তার জন্মতারিখ উল্লেখ করতে হয়। উক্ত তারিখের সমর্থনে জন্ম সংক্রান্ত সরকারি শংসাপত্রের কপি বা ঠিকুজি কপি দিতে হবে। পিতা-মাতার মৌখিক বিবৃতি অনুসারে জন্মতারিখ গ্রাহ্য হতে পারে।

প্রকল্পের সুবিধা

এই প্রকল্পে উপভোক্তা প্রতি মাসে ২৫ টাকা দিলে সরকার ৩০ টাকা দেয়। অর্থাৎ খাতায় প্রতি মাসে ৫৫ টাকা করে জমা পড়বে। ১৮ বছর বয়সে যদি কোনও উপভোক্তা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তিনি সাকুল্যে ১২ হাজার ৭০০ টাকার মতো জমা দেবেন এবং ওই উপভোক্তা যদি ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তিনি সুদসহ প্রায় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ফেরত পাবেন। এখানে বলে রাখা ভালো এই প্রকল্পে থাকাকালীন উপভোক্তা স্বাস্থ্য বিমা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।

এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোনও শ্রমিক যদি তিন মাসের টাকা অর্থাৎ ৭৫ টাকা জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে রাজ্য সরকার ওই তিন মাসের নিরিখে ৯০ টাকা জমা দেবেন। কিন্তু একটি আর্থিক বছরের মধ্যে (৩১ মার্চ) উপভোক্তাকে বছরের যে কোনও সময়ই পুরো টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। কোনও উপভোক্তা যদি শুধুমাত্র এক মাসের কিস্তি জমা দেন, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও ওই এক মাসের জন্যই টাকা দেবেন। এক্ষেত্রে উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট সচল থাকবে। অন্তত তিনটি আর্থিক বছরে কোনও টাকা জমা না দিলে তবেই তার সদস্যপদ বাতিল হবে। তবে সহকারী শ্রম কমিশনার-এর কাছে আবেদনক্রমে তার অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করা যেতে পারে।

এখানে উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, কোনও উপভোক্তা কোনও অর্থ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে টাকা জমা দিচ্ছেন না। মে মাস নাগাদ যদি ওই উপভোক্তা বকেয়া টাকা জমা দিতে চান, তাহলে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের জন্য টাকা নেওয়া যাবে না। উপভোক্তার কাছ থেকে এপ্রিল মাস থেকেই টাকা নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে তার অ্যাকাউন্টও সচল থাকবে। যেহেতু উপভোক্তার কাছ থেকে প্রতি মাসে ২৫ টাকা হিসাবে ৭৫ টাকা নেওয়া হল না, রাজ্য

সরকারও ওই তিন মাসের জন্য ৯০ টাকা তার অ্যাকাউন্টে জমা দেবে না। কিন্তু এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকার আবার প্রতি মাসে ৩০ টাকা করে জমা দেবেন, অবশ্যই উপভোক্তা প্রকল্পটি চালু রাখেন। উপভোক্তাকে এখানে মনে রাখতে হবে কোনও অর্থবর্ষে যে কয় মাস তিনি টাকা জমা দেবেন না সেই মাসগুলিতে রাজ্য সরকারেরও কোনও সাহায্য পাবেন না।

টাকা কোথায় জমা দিতে হবে

শ্রম পরিদর্শকের অফিসে উপভোক্তা টাকা জমা দিতে পারেন। এছাড়াও কিছু কালেক্টিং এজেন্ট আছেন, যেমন এস.এল.ও আই.সি.ডি.এস. কর্মী। এদের কাছেও টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও স্থানীয় অফিসে গিয়েও টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উপভোক্তারা টাকা যে জমা দিচ্ছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য এই প্রকল্পে যে পাশবই রয়েছে তা নিয়মিত হালনাগাদ করে নিতে পারেন এজেন্টদের মাধ্যমেই। টাকা জমা দেওয়ার সময় উপভোক্তা এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ যেমন নেবেন তেমনি পাশবইও সময়মতো হালনাগদ করিয়ে নেবেন। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে প্রত্যেক উপভোক্তাকে অ্যাকাউন্টস স্লিপ দেওয়া হয় যেখানে সারা বছরে মোট জমা টাকার উল্লেখ থাকে।

প্রকল্পে পরিবারের সংজ্ঞা

সুবিধাভোগী শ্রমিকের পরিবারের সদস্য হিসাবে শ্রমিক, তার স্ত্রী/স্বামী, সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কন্যা, নাবালক পুত্র, সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বাবা/মা বিবেচিত হবেন। একই পরিবারের একাধিক শ্রমিক এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন না, আইনে এমন কিছু বলা নেই। কিন্তু পরিষ্কার করে আইনে বলা আছে যে, একই পরিবারের অপর কোনও শ্রমিক যদি সাসপফাও কর্মসূচিতে আসতে চান তাহলে অপর শ্রমিককেও একইভাবে আবেদন করতে হবে। সেই সঙ্গে এই প্রকল্পে আসার শর্তাবলি পূরণ করতে হবে।

উপভোক্তা ইচ্ছা-অনিচ্ছা

উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ২৫০০ টাকা থাকলে এবং ৪৮টি মাসিক কিস্তির টাকা জমা দিলে তবে উপভোক্তা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে পারেন। আবার কোনও সময় অসুবিধা মনে হলে প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। অথবা তার টাকা পয়সা দরকার হলে সঞ্চিত টাকা নিয়ে প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। এক্ষেত্রে উপভোক্তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। টাকা তোলার তিনি দরখাস্ত করবেন সংশ্লিষ্ট সহকারী শ্রম কমিশনার-এর কাছে। উপভোক্তা যে টাকা জমা দিয়েছেন, সরকারি অনুদান এবং সুদ যা তার প্রাপ্য সেই পরিমাণ টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হয়। প্রকল্প থেকে একবার বেরিয়ে গেলে পুনরায় উপভোক্তা এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে নতুন করে উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

নমিনি নির্বাচন

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ই আবেদনপত্রের ৮নং ক্রমিকে যাকে মনোনীত করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে। নমিনির নাম পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং এই নমিনি পরিবর্তন করা সম্ভব। ৬০ বছর বয়সের পূর্বে কোনও উপভোক্তা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনি ৮নং ফর্মের দুই কপি আবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন। আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ পৌর প্রতিনিধি একটি শংসাপত্র দেবেন। ওই উপভোক্তা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যত টাকা জমা করেছেন এবং রাজ্য সরকার যত টাকা দিয়েছে, সমস্ত টাকা সুদসহ মনোনীত ব্যক্তি বা যোগ্য উত্তরাধিকারী ফেরত পারেন।

জমা টাকা ফেরত পাওয়ার পদ্ধতি

জমা টাকা ফেরত পাবার জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পরিচয়পত্র তথা পাশবইসহ সংশ্লিষ্ট শ্রম কমিশনারের অফিসে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ওই উপভোক্তার একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে অথবা খুলতে হবে। আবেদনপত্র মঞ্জুর হলে উপভোক্তার টাকা ওই অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে।

অসংগঠিত শিল্প

(১) দরজি শিল্প, (২) দোকান ও সংস্থা, (৩) বেকারি, (৪) বেকারি দ্রব্যের সরবরাহে নিযুক্ত শ্রমিক, (৫) হস্তচালিত তাঁত শিল্প, (৬) কুটির এবং গ্রামীণ কুটির শিল্প (চুড়ি তৈরি, আতশবাজি, চাকিকল, ঘুড়ি ও ঘুড়ির কাঠি প্রস্তুতি, মৃৎপাত্র শিল্প, ধান ভাঙা, সুচিশিল্পে জরি-চিকনের কাজ), (৭) গালা শিল্প, (৮) পাথর ভাঙা, (৯) আই.সি.ডি.এস.আই.পি.পি.-VIII এবং সি.উই.ডি.পি.-III, (১০) মোটরগাড়ি মেরামতির গ্যারাজ, (১১) ইট টালি প্রস্তুতকরণ, (১২) নিরাপত্তা সংস্থা (Security Agency), (১৩) ছাপাখানা, (১৪) বইখাতা বাঁধাই, (১৫) চর্ম ও চর্ম দ্রব্যসমূহ, (১৬) হোসিয়ারি, (১৭) করাতকল, (১৮) প্লাস্টিক শিল্প, (১৯) ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, (২০) ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত নার্সিংহোম বেসরকারি হাসপাতল, (২১) সিল্ক প্রিন্টিং, (২২) ডালকল, (২৩) তেলকল, (২৪) ডেকরেশন, (২৫) কাগজ ও পিচবোর্ডের বাক্স তৈরিতে নিযুক্ত শ্রমিক, (২৬) বিড়ি তৈরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, (২৭) নৌকা পরিচালন পরিষেবা, (২৮) রেশম গুটির চাষ, (২৯) ধানকল, (৩০) বনজ এবং কাষ্ঠ শিল্প, (৩১) রবার ও রবারজাত দ্রব্য, (৩২) হাড় গুঁড়ো করার কারখানা, (৩৩) চীনামাটি শিল্প, (৩৪) কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ, (৩৫) নারকেল ছোবড়া শিল্প, (৩৬) পোশাক তৈরি, (৩৭) আদালত-রেজিস্ট্রি অফিসে লিপিকরণ কাজে নিযুক্ত কর্মী, (৩৮) কসাইখানা, (৩৯) টাইপ, (৪০) জুতো তৈরি (চর্ম, রবার, প্লাস্টিক), (৪১) যন্ত্রচালিত তাঁত, (৪২) ক্ষুদ্র রাসায়নিক শিল্প, (৪৩) ঢালাই-এর কাজ, (৪৪) পিতল দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, (৪৫) হস্তচালনার মাধ্যমে পাথর ভাঙা, (৪৬) চলচ্চিত্র শিল্প, (৪৭) খাদি, (৪৮) সিঙ্কোনা ব্যতীত অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ বাগিচা, (৪৯) হোটল ও রেস্তোরাঁ।

স্বনিযুক্তি পেশার তালিকা

(১) সাইকেল রিকশা ও ভ্যানচালক, (২) মুটে ও মাল ওঠানো নামানোর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, (৩) রেলওয়ে হকার, (৪) পথ ফেরিওয়ালা, (৫) মুচি/জুতা তৈরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, (৬) স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, (৭) আয়া/হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে রোগী কাজে নিযুক্ত পরিচারক/পরিচারিকা, (৮) ছুতোর, (৯) গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত কর্মী, (১০) ক্ষৌরকর্মী ও রূপসজ্জা শিল্পী (Beauticians), (১১) মূর্তি শিল্পী, (১২) মৎস্যজীবী।❑

ফিজিক্যাল এডুকেশন—খেলাই যখন পেশা

মহুয়া গিরি

গুরু রমাকান্ত আচরেকরের অক্লান্ত সাধনা ছাড়া ছোট্ট 'তেন্ডলা' কি আজকের শচিন তেন্ডুলকর হতেন? শুধু জয়ের গর্ব নয়, খেলোয়াড় বা দলের হারের গ্লানিও সমানভাবে বর্তায় কোচের ওপর। ২০১৪ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে জার্মান-ঝড়ে যখন ঘরের মাঠে ব্রাজিলের ব্যারিকেড মুখ থুবড়ে পড়ল, সেই হারের সমস্ত দায়টাই নিজের কাঁধে নিয়েছেন কোচ স্কোলারি। পেশার জন্য প্রকৃত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধ ছাড়া কি এটা সম্ভব?

যাঁরা লড়াকু, খেলতে ভালোবাসেন, চিরাচরিত চাকরির বদলে, খেলা নিয়েই কেরিয়ার গড়তে চান—তাঁদের জন্য রইল এবার কেরিয়ারের সুলুক-সন্ধান।

শুধু খেলোয়াড় নয়, খেলা দুনিয়া ঘিরে রয়েছে আরও হাজারো পেশা। তার জন্য স্নাতক স্তর থেকেই পড়তে পারেন, 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' বা খেলা নিয়ে অন্যান্য পেশাদার কোর্সও।

খেলার দুনিয়ায় কোন কোন পেশায় আসা যায়?

ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষক—প্রাথমিক হোক বা মাধ্যমিক—সব স্কুলেই খেলার শিক্ষকের প্রয়োজন। শুধু পড়া নয়, শরীরচর্চাও সমান জরুরি। "You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita"—স্বামী বিবেকানন্দের এই উপদেশ পড়ুয়াদের মধ্যে সফল রূপ দেওয়াই তো একজন আদর্শ ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। খেলার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে শরীরচর্চা, নিয়মানুবর্তিতা, সুস্বাস্থ্যের অভ্যেস গড়ে তোলাও ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষকের দায়িত্ব। এই পেশায় চাকরির সঙ্গে রয়েছে শিক্ষকতার আনন্দ, আজকের শিশুদের ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারার গর্বও।

কোচিং—ক্রিকেট, ফুটবল, হকির মতো টিমগেম হোক বা টেনিস, ব্যাডমিন্টনের মতো একার খেলা—পেশাদার খেলোয়াড়দের দক্ষ ট্রেনিং দিতে পারেন একমাত্র কোচেরাই। খেলোয়াড়দের দক্ষতা এবং যোগ্যতা বুঝে ম্যাচের পরিকল্পনা বা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করাও কোচের অন্যতম কাজ। শুধু দেহের কসরত নয়, টিমের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রেখে দলকে পরিচালনার দায়িত্বও এই কোচেদের ওপর। ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেল, সন্দীপ পাটিল; ফুটবলে ফ্রানজ বেকেনবাওয়ার, মারাদোনা, সুভাষ ভৌমিক, সুব্রত ভট্টাচার্য, অমল দত্ত, পি কে ব্যানার্জি; টেনিসে বরিস বেকার, স্টিফেন এডবার্গ-এর মতো বহু বিখ্যাত খেলোয়াড় পরবর্তী জীবনে কোচিংকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সুঠাম শরীর সঙ্গে লড়াকু মানসিকতা ও পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গিই একজন খেলোয়াড়কে পরবর্তী জীবনে কোচ হিসেবে গড়ে তোলে।

স্পোর্টস ইন্সট্রাকটর—টিমের জন্য যেমন কোচ, পেশাদার খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ট্রেনিং-এর জন্য থাকেন স্পোর্টস ইনস্ট্রাকটরেরা। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও দুর্বলতার খুঁটিনাটি বুঝে নিয়ে আরও দক্ষভাবে খেলার জন্য পরামর্শ দেন ইনস্ট্রাকটর। শুধু তাই নয়, খেলা চলাকালীন স্ট্রেস বা স্নায়বিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক আঘাত বাঁচিয়ে কীভাবে সেরাটা দিতে হবে—সে বিষয়েও গাইড করেন ইনি। খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অটুট রাখাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

খেলার দুনিয়া ঘিরে রয়েছে আরও নানান পেশা। ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়ার পর স্পেশালাইজড কোর্স করে এই সমস্ত পেশায় আসা যায়। অ্যাকোয়া ফিটনেস, চিরোপ্রাকটর, বায়োমেকানিস্ট, কর্পোরেট ওয়েলনেস ট্রেনার, এক্সারসাইজ সাইকোলজিস্ট, হেল্‌থ ক্লাব ইনস্ট্রাকটর, স্পোর্টস মেডিসিন, মিলিটারি ফিটনেস, রিক্রিয়েশন থেরাপিস্ট, স্পা-রিসর্ট ওয়েলনেস এগ্‌জিকিউটিভ। স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের মতো পেশাদার কোর্স করার পর হতে পারেন—অ্যাথলেটিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ক্যাম্পাস ডিরেক্টর, স্পোর্টস ক্লাব ম্যানেজার, স্পোর্টস রিটেইলিং ম্যানেজার, স্পোর্টস অর্গানাইজার। সুযোগ রয়েছে—স্পোর্টস ল, স্পোর্টস মার্কেটিং, স্পোর্টস ফোটোগ্রাফি, স্পোর্টস জার্নালিস্ট, স্পোর্টস পাবলিশিং, ব্রডকাস্টিং, কমেন্টেটর-এর মতো পেশাদার জীবিকাও।

যোগ্যতা

এদেশে দ্বাদশ পাশ করার পর স্নাতক স্তরে ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়বার সুযোগ রয়েছে। স্নাতক স্তরে ৩-৪ বছরের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বা বিপিএড ডিগ্রি নেওয়া যায়। আবার যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পরও ১ বছরের বিপিএড কোর্সও করা যায়। এরপর রয়েছে, এমপিএড, এমফিল ও পিএইচডি করার সুযোগ। স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট বা স্পোর্টস মেডিসিনের মতো খেলার দুনিয়া ঘিরে অন্যান্য পেশাদার কোর্সও করা যেতে পারে।

কোথায় পড়বেন—যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি বেলুড়, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে বিপিএড, এমপিএড, এমফিল ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন ও পিএইচডি করার সুযোগ আছে।

দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই কোর্স পড়ানো হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বরকতুল্লাহ ইউনিভার্সিটি, সম্বলপুর ইউনিভার্সিটি, ম্যাঙ্গোলোর ইউনিভার্সিটি।❑

যোজনা ? কুইজ

১. ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা ছিল বেশি। শতাংশের হিসেবে কত?

২. বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে ৫০তম হ্যাটট্রিকটি করেছেন সাকিরি। তিনি কোন দেশের ফুটবলার?

৩. জাতীয় গণিত দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়?

৪. স্পেনের রাফায়েল নাদাল ২০১৪ সালের পুরুষদের সিঙ্গলসে ফরাসি ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এটি নাদালের কততম ফরাসি ওপেন টেনিস খেতাব জয়?

৫. ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন বিশিষ্ট হিন্দি কবি কেদারনাথ সিং। এখনও পর্যন্ত কত জন বাঙালি সাহিত্যিক এই সম্মান পেয়েছেন?

৬. হিন্দি চলচ্চিত্রকে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় করার জন্য কোন বিশিষ্ট অভিনেতা ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অ-সামরিক সম্মান নাইট অফ দ্য লিজিয়ন অব অনার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন?

৭. কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী রাষ্ট্রসংঘের সমুদ্র এবং সামুদ্রিক আইন বিষয়ক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন?

৮. কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারকে নিয়ে লেখা জীবনীগ্রন্থটির নাম কী?

৯. বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে দ্রুততম গোলটি কে করেছেন?

১০. পুরীর জগন্নাথ মন্দির কে স্থাপন করেন?

১১. কান সম্পর্কিত বিদ্যাকে কী বলা হয়?

১২. কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে?

১৩. পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত?

১৪. গার্দি উপজাতির মানুষেরা ভারতের কোন রাজ্যের বাসিন্দা?

১৫. ষোড়শ লোকসভায় সংসদীয় ইতিহাসে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। সংখ্যায় কত?

উত্তর :

১. ১৪ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনসূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ২. সুইজারল্যান্ড। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম হ্যাটট্রিকটি করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ট পাটেনাউডি। ১৯৩০ সালে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। ৩. ২২ ডিসেম্বর। বিশিষ্ট গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের জন্মদিনকে গণিত দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে। ৪. নবম। তিনি টানা পাঁচবার এই প্রতিযোগিতা জেতার নজির গড়েছেন। ৫. পাঁচ জন। এঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬), কবি বিষ্ণু দে (১৯৭১), আশাপূর্ণা দেবী (১৯৭৬), কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৯১) এবং মহাশ্বেতা দেবী (১৯৯৬)। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ১৯৬৫ সাল থেকে। ৬. শাহরুখ খান। এর আগে এই সম্মান পেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। ৭. বিজ্ঞানী রসিক রবীন্দ্র। ৮. 'সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড শ্যাডো'। লিখেছেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক উদয়তারা নায়ার। ৯. তুরস্কের হাসান সুকুর। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ১১ সেকেন্ডে। এবছর ব্রাজিল বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিন্ট ডেম্পসি ২৯ সেকেন্ডে গোল করেন ঘানার বিরুদ্ধে। ১০. অনন্তদেব বর্মন। ১১. ওটোলজি। ১২. রেড ক্রস। ১৯১৭; ১৯৪৪ এবং ১৯৬৩ সালে। রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্ট। ১৩. আলিপুরদুয়ার। এটি পশ্চিমবঙ্গের ২০তম জেলা। জলপাইগুড়ি ভেঙে ২৫ জুন আত্মপ্রকাশ করে। ১৪. হিমাচলপ্রদেশ। এঁরা মূলত পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৫. ৬১ জন।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫

কৌশলের সামান্য রদবদল

এবারের বাজেটে নতুন ক্ষমতায় আসা সরকারের একটি বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ দ্বারা উচ্চহারে অর্থনৈতিক বিকাশ উন্নততর সুযোগসুবিধা, পরিকাঠামো ও প্রশাসনকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। উদ্দেশ্য ও তা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রশংসনীয় হলেও পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। সেসব অসংগতি কোথায় চোখে পড়ছে? সে সব ত্রুটিগুলিই বা রয়ে গেল কেন? লিখছেন **অসীমা গোয়েল**।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

সাধারণ বাজেট

এবারের সাধারণ বাজেট, তার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপট, প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বিশদ আলোচনা এই নিবন্ধে। কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মতো মূলগত বিষয়গুলির প্রসঙ্গে বাজেটে কী দিশানির্দেশ রয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন দুই লেখক **চরণ সিং** ও **সারদা শিম্পি**। *রয়েছে বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শও।*

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

নিরস প্যাকেজিং-এ সরস বাজেট

নতুন সরকারের পয়লা বাজেট। তৈরির জন্য সময় মিলেছে মাত্র ৪৫টি দিন। রাজস্ব ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। অর্থনীতিতে ডামাডোল। এসবের মাঝে বিকাশের হার চাঙা করার পথ দেখানো চাট্টিখানি কথা নয়। সীমিত সময় সত্ত্বেও বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এককথায়, বাজেটে মুনশিয়ানার ছাপ যথেষ্ট। বাজেটের প্যাকেজিং ও উপস্থাপনা নিয়ে সেকথা বলা যাচ্ছে কই।—**রবীন্দ্র এইচ ঢোলাকিয়া।**

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

রেল বাজেট কি এবার কিছুটা বাস্তবমুখী

রেলের হাল বাস্তবিকই উদ্বেগজনক। খোদ মন্ত্রী রেল বাজেটে তা কবুল করেছেন। এবার বাজেটে সমস্যাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এক গুচ্ছের প্রস্তাব আছে। সংস্থার আর্থিক কাঠামো জোরদার করার জন্য এ নিবন্ধে মাশুল নীতি নিয়ে কিছুটা বিশদ আলোচনা আছে। কিছু প্রস্তাবের তারিখ করলেও বুলেট প্রকল্প নিয়ে মাতামাতির বিরুদ্ধে নিবন্ধকার **এস শ্রীরমণ** *সরব। বেসরকারিকরণ বা রেলকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনে পরিণত করা নিয়ে আছে তাঁর মতামত। সবশেষে, নিবন্ধের রায় বাজেটের ভিশন বাস্তবায়িত করতে অবিলম্বে চাই এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা।*

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫—একটি সমীক্ষা

লোকসভা ভোটে বিপুল জয়লাভের পর এনডিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅরুণ জেটলি তাঁর প্রথম বাজেট পেশ করলেন। নতুন সরকারের নতুন বাজেটে নতুনত্ব কিছু আছে কি? নাকি এই বাজেট পূর্বতন সরকারের বাজেটের মতোই? মোদী সরকারের এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য কী? এই সমস্ত বিষয় নিয়েই বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করছেন **জয়দেব সরখেল।**

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৪-১৫

করবিন্যাস ও তার বিশ্লেষণ

এবারের বাজেটের করবিন্যাসের প্রতি নজর রাখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা হালকা রেখেও রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে দেশের আর্থিক অবস্থাকে যথাসম্ভব স্থিতিশীল করে তোলার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তবে এই ভারসাম্যের পথে হাঁটলে দেশের ও দেশের মানুষের সত্যিকারের মঙ্গল কি সাধিত হবে? লিখছেন **ড. চিত্তরঞ্জন সরকার।**

বাজেট মানে প্রত্যাশা—কর দায় কম হওয়ার প্রত্যাশা করদাতাদের দিক থেকে এবং কর আদায় বেশি করার প্রত্যাশা সরকারের পক্ষে। সাধারণ করদাতারা করবোঝায় ভারাক্রান্ত—আয়ের অনেকটাই তাদের চলে যায় কর দায় মেটাতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে অতিরিক্ত ব্যয় মেটানো ইত্যাদিতে। এছাড়াও, সাধারণভাবে করদাতারা করপ্রদানে উৎসাহী হন না যেহেতু করপ্রদান একমুখী। সরকারকে করপ্রদানের জন্য সরকারের কাছ থেকে তাঁরা কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পান না—অন্তত প্রত্যক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে তাঁরা সরকারি সুবিধা যে ভোগ করেন না তা নয়, জনকল্যাণে সরকারি তহবিল থেকে অর্থব্যয়, জনসাধারণের জন্য পরিকাঠামোক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় ও অনুদান, সরকারি সাহায্য, ভরতুকি ইত্যাদি তারা অবশ্যই ভোগ করেন—যদিও তা সমাজের সকলেই ভোগ করেন—যিনি কর বেশি দেন, কর কম দেন বা আদৌ কর দেন না এরকম সকলেই। ফলে, করপ্রদানে করদাতারা সততই কম আগ্রহী হন।

এদিকে সরকারি তহবিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল কর বাবদ রাজস্ব আদায়। কারণটা খুবই স্বাভাবিক—যেহেতু কর আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতে সরকারের কোনও দায় বৃদ্ধি হয় না, সংগৃহীত কর ফেরতযোগ্য নয়—অবশ্য যদি তা সঠিক ও ন্যায়সংগত হয়। ঋণ নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি মেটানো যায় কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির পরিপন্থী এবং তা মঙ্গলজনকও নয়। ঋণ নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা খুবই বিপজ্জনক কারণ এর ফল দীর্ঘমেয়াদি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মোটা অঙ্কের ঋণ পরিশোধ ছাড়াও নিয়মিতভাবে সুদবাবদ অর্থপ্রদান করতে হয়—এতে অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে ঋণের বোঝা জনসাধারণকেই বইতে হয়।

এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী মাননীয় অরুণ জেটলি তাঁর প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে ২০১৪-১৫ আর্থিক বৎসরের জন্য যে করবিন্যাস দেখিয়েছেন তাতে কমবেশি দুপক্ষই খুশি—যদিও তা প্রত্যাশা মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মতো দেশ, যেখানে জন-বিস্ফোরণ একটা বিরাট সমস্যা, সেখানে করদাতাদের খুশি করার জন্য যথেচ্ছ কর ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তা করলে কর আদায়ের পরিমাণ ও করের ভিত খুবই সংকুচিত হবে যার ফলে সরকারের পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজ ও পরিষেবা প্রদান করা ব্যাহত হয়ে পড়বে উপযুক্ত তহবিলের অভাবে। একটি সুস্থ অর্থনীতির কাছে এটা কখনওই কাম্য নয়। এমতাবস্থায়, সামগ্রিকভাবে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে বেশ কিছু করছাড়ের ঘোষণা করেছেন করদাতাদের খুশি করতে এবং কিছু ক্ষেত্রে কর আদায় বাড়ানোর পক্ষেও লোকসভায় প্রস্তাব পেশ করেছেন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কথা ভেবে। যদিও করের হার বা কাঠামোয় তিনি কোনও রদবদল করেননি। এই করবিন্যাসের ফলে বাজেটে ঘাটতি বাড়বে যার জন্য স্বাভাবিকভাবেই সরকারকে ঋণ নিতে হবে। বাজেটে এবার সরকারি ভরতুকির পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে—গত ২০১৩-১৪ বাজেটে যেখানে ভরতুকি ছিল ২ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা, তা এবারের বাজেটে বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা।

আয়কর

২০১৪-১৫ আর্থিক বৎসরের বাজেটে আয়কর হারে কোনও পরিবর্তন না করলেও সাধারণ করদাতাদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী করযোগ্য আয়ের প্রাথমিক ছাড় যা আগে ছিল ২ লক্ষ টাকা তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করেছেন অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক সাধারণ করদাতাদের জন্য। প্রবীণ করদাতা যাদের বয়স ৬০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে এই ছাড় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অবশ্য অতি প্রবীণ করদাতা যাদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এই ছাড় আগের মতোই অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকাই আছে। সাধারণ করদাতাদের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক ছাড়ের বৃদ্ধি যেখানে ২৫ শতাংশ (আগের ২ লক্ষ টাকার সাপেক্ষে এখন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা বেশি), সেখানে প্রবীণ করদাতাদের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক ছাড়ের বৃদ্ধি হার ২০ শতাংশ (আগের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সাপেক্ষে এখন ৩ লক্ষ টাকা,